ইসলাম শিক্ষা

ষষ্ঠ শ্রেণী

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ১৯৯৬ শিক্ষাবর্ষ
থেকে ষষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

ইসলাম-শিক্ষা

ষষ্ঠ শ্রেণী

সংকলন ও রচনায়

এ বি এম আব্দুল মান্নান মিয়া
ড. মুহাম্মদ শফীকুল্লাহ
মুহাম্মদ আবদুল মালেক
হাফেয মুহাম্মদ লুৎফর রহমান

সম্পাদনায়

মুহাম্মদ আবদুস সালাম খান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯–৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম মুদ্রণ : জানুয়ারি, ১৯৯৬
সংশোধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ : নভেম্বর, ২০০০
পরিমার্জিত সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০০৮
পুনর্মুদ্রণ :

কম্পিউটার কম্পোজ
ফাইন ডট লিঃ

প্রচ্ছদ
সেলিম আহ্‌মেদ

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।

মুদ্রণ :

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায় : আকাইদ	**১–৯**
তাওহীদ	১
কালিমা তায়্যিবা, কালিমা শাহাদাত	২
ঈমান মুজমাল	৩
আস্‌মাউল হুসনা, আল্লাহ মালিক	৪
আল্লাহ : কারীম, আলীম, হাকীম	৫
রিসালাত	৬
আখিরাত	৭
দ্বিতীয় অধ্যায় : ইবাদাত	**১০–২৪**
পবিত্রতা, নাজাসাত	১১
ওযূ, তায়াম্মুম	১২
গোসল, সালাত	১৩
সালাতের সময়সূচি	১৪
সালাত আদায়ের নিয়ম	১৬
সালাতের : ফরয, ওয়াজিব	১৮
সালাতের সুন্নাত	১৯
সালাতের মুস্তাহাব, সালাত ভঙ্গ হওয়ার কারণ	২০
সালাত মাকরূহ হওয়ার কারণ, সিজদাহ সাহু	২১
সিজদাহ তিলাওয়াত	২২
তৃতীয় অধ্যায় : কুরআন মাজীদ ও হাদীস শরীফ শিক্ষা	**২৫–৩৮**
কুরআন মাজীদ	২৫
তাজবীদ, মাখরাজ	২৬
সূরা আল-ফাতিহা	২৮
সূরা আন্ নাস	২৯
সূরা আল-ফালাক	৩০
সূরা আল-আসর	৩২
সূরা আল-হুমাযাহ	৩৩
মুনাজাতমূলক তিনটি আয়াত	৩৪
হাদীস শরীফ	৩৫
চতুর্থ অধ্যায় : আখলাক	**৩৯–৫১**
আখলাকে হামীদাহ্	৩৯
তাকওয়া, তাওয়াক্কুল	৪০
সত্যবাদিতা	৪১
ওয়াদা পালন, পিতামাতার প্রতি কর্তব্য	৪২
আত্মীয়-স্বজনের প্রতি কর্তব্য	৪৩
প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্য, বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা ও ছোটদের প্রতি স্নেহ	৪৪
সহপাঠীদের সাথে সদ্ব্যবহার, আখলাকে যামিমা, মিথ্যাচার	৪৫
গীবত বা পরনিন্দা, গালি দেওয়া	৪৬
আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা, রাহ্বানি	৪৭
ধূমপান ও মাদকাসক্তির কুফল, ধূমপান	৪৮
মাদকাসক্তি	৪৯
পঞ্চম অধ্যায় : আদর্শ জীবন চরিত	**৫২–৬৫**
হযরত আদম (আ)	৫২
হযরত নূহ (আ)	৫৩
হযরত সালিহ (আ)	৫৪
বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (স)	৫৪
হযরত আবূ বকর (রা)	৫৬
হযরত উমার ফারূক (রা)	৫৮
হযরত উসমান (রা)	৫৯
হযরত আলী (রা)	৬০
হযরত খাদিজা (রা)	৬১
হযরত ইমাম আবূ হানিফা (র)	৬২
হযরত আবদুল কাদির জিলানী (র)	৬২
হযরত শাহ জালাল (র)	৬৩

প্রসঙ্গ কথা

শিক্ষার উন্নয়ন ব্যতীত জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের উন্নয়নের ধারায় জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনপ্রবাহ যাতে পাঠ্যপুস্তকে প্রতিফলিত হয়, সেই লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটির সুপারিশক্রমে আশির দশকের প্রারম্ভে প্রবর্তিত হয় নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য নতুন পাঠ্যপুস্তক। দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় ধরে এই পাঠ্যপুস্তকগুলো প্রচলিত ছিল।

উন্নয়নের ধারায় ১৯৯৪ সালে নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম সংস্কার, পরিমার্জন ও বাস্তবায়নের জন্য "শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত টাস্কফোর্স" গঠিত হয়। ১৯৯৫ সালে নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। সময়ের সাথে সাথে দেশ ও সমাজের চাহিদা পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে ২০০০ সালে নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের প্রায় সকল পাঠ্যপুস্তক উচ্চ পর্যায়ের বিশেষজ্ঞদের দ্বারা যৌক্তিক মূল্যায়নের মাধ্যমে পুনরায় সংশোধন ও পরিমার্জন করা হয়। ২০০৮ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত শিক্ষা বিষয়ক টাস্কফোর্সের সুপারিশে প্রচ্ছদ প্রণয়ন, বানান ও তথ্যগত বিষয় সংশোধনসহ পাঠ্যপুস্তক আকর্ষণীয় করা হয়েছে। আশা করা যায়, পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর নিকট আরো গ্রহণযোগ্য ও সময়োপযোগী বলে বিবেচিত হবে।

শিক্ষাক্রমের আলোকে মূল্যায়নকে আরো ফলপ্রসূ করার জন্য দেশের সুধীজন ও শিক্ষাবিদগণের পরামর্শের প্রেক্ষিতে সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিটি অধ্যায় শেষে বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্ন সংযোজন করা হয়েছে। প্রত্যাশা করা যায়, এতে শিক্ষার্থীর মুখস্থনির্ভরতা বহুলাংশে হ্রাস পাবে এবং শিক্ষার্থী তার অর্জিত জ্ঞান ও অনুধাবন বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে বা যে-কোনো বিষয়কে বিচার-বিশ্লেষণ অথবা মূল্যায়ন করতে পারবে।

নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ইসলাম-শিক্ষা আবশ্যিক বিষয়। শিক্ষাক্রমে ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য ইসলাম-শিক্ষা বিষয়ের শ্রেণীভিত্তিক শিখনফল চিহ্নিত করা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা যেন সেগুলো পুরোপুরি অর্জন করতে পারে সেদিকে দৃষ্টি রেখে শিখণফলভিত্তিক পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হয়েছে। এ শ্রেণীতে আকাইদ, ইবাদাত, কুরআন মাজীদ ও হাদীস শরীফ শিক্ষা, আখলাক এবং আদর্শ জীবনচরিত সম্পর্কে স্বল্পপরিসরে উপস্থাপন করা হয়েছে। ইসলামের নিয়ম-কানুন জানা ও মানা এবং মূল্যবোধ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীদের আগ্রহী করে তোলার জন্য সহজ বাক্যরীতি, উপমা, শিক্ষামূলক কাহিনী, আদর্শ মানবের জীবনকথা ইত্যাদি অবতারণা করা হয়েছে। ইসলাম সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা সৃষ্টিতে পুস্তকটি সহায়ক হবে বলে মনে করি। উল্লেখ্য, কিছু আরবি শব্দের বানানের ক্ষেত্রে এনসিটিবি'র বানানরীতি অনুসরণ না করে প্রচলিত বানান অনুসরণ করা হয়েছে।

আমরা জানি, শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং এর ভিত্তিতে পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। কাজেই পাঠ্যপুস্তকের আরো উন্নয়নের জন্য যেকোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসঙ্গত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হবে। ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে প্রত্যাশিত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার নিরন্তর প্রচেষ্টার সঙ্গী হিসেবে শিক্ষার্থীদের সুষ্ঠু বিকাশে বর্তমান সংস্করণে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস ও চেতনা প্রতিস্থাপিত হয়েছে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে পরিমার্জিত পাঠ্যপুস্তকগুলো প্রকাশ করতে গিয়ে কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণে পাঠ্যপুস্তকগুলো আরো সুন্দর, শোভন ও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

যাঁরা এই পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন, সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন, তাঁদের জানাই ধন্যবাদ। যাদের জন্য পাঠ্যপুস্তকটি প্রণীত হল, আশা করি তারা উপকৃত হবে।

প্রফেসর মোঃ মোস্তফা কামালউদ্দিন

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রথম অধ্যায়

আকাইদ (اَلْعَقَائِدُ)

তাওহীদ (تَوْحِيْدٌ)

পরিচয়

তাওহীদ শব্দের অর্থ একত্ববাদ। ইসলামী পরিভাষায় একমাত্র আল্লাহ তাআলাকেই সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, বিধানদাতা এবং ইবাদাতের মালিক একক সত্তা হিসেবে বিশ্বাস করা ও মেনে নেওয়াকে তাওহীদ বলে।

তাৎপর্য

আমাদের ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র, জামাকাপড় ইত্যাদি কেউ-না-কেউ তৈরি করেছেন, নিজে নিজে তৈরি হয়নি। তেমনি আমাদের মাথার ওপর বিশাল আকাশ। তাতে আছে গ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য। আবার আমরা যে পৃথিবীতে বাস করছি তাও কত সুন্দর। এতে আছে নদীনালা, সাগর, মহাসাগর, পাহাড়পর্বত, বনজঙ্গল। আরও আছে নানারকম জীবজন্তু, আছে ফল, ফুল, ফসল। এসবও নিজে নিজে সৃষ্টি হয়নি। নিশ্চয়ই এসবেরও একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন, যিনি অত্যন্ত নিপুণভাবে এসব সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি হলেন মহান আল্লাহ। তিনি সমস্ত সৃষ্টির লালনপালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করেন। তিনি এক, অদ্বিতীয় ও অতুলনীয়। তাঁর কোনো অংশীদার নেই এবং তাঁর সঙ্গে কোনোকিছুরই তুলনা হয় না। একমাত্র তিনিই ইবাদাত পাওয়ার যোগ্য। এই বিশ্বাসের নাম তাওহীদ।

আল্লাহর পরিচয়

আল্লাহ পাক তাঁর অস্তিত্ব ও সত্তায় যেমন একক, অদ্বিতীয় ও অতুলনীয়, তেমনি তিনি তাঁর গুণাবলিতেও অতুলনীয়। তাঁর সত্তা ও গুণের সঙ্গে তুলনা করা যায় এমন কোনোকিছুই নেই। তিনি অনাদি, অনন্ত, চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী। আমরা আল্লাহ তাআলাকে এক ও অদ্বিতীয় বলে জানব এবং বিশ্বাস করব। আর একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করব।

তাওহীদে বিশ্বাসের গুরুত্ব

ঈমানের প্রথম কথা হল আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস। আর আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের মূলকথা হল তাওহীদে বিশ্বাস। ইসলামের সকল বিধান এবং সকল শিক্ষাই তাওহীদে বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সর্বপ্রথম নবী হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স) পর্যন্ত সকল নবী-রাসূল মানুষের দিশারী হিসেবে পৃথিবীতে এসেছেন। তাঁরা সবাই তাওহীদ প্রচার করেছেন, তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছেন, অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন।

তাওহীদে বিশ্বাসের নযীর

আমরা সবাই প্রসিদ্ধ নবী হযরত ইবরাহীম (আ)-এর নাম জানি। তিনি এক পুরোহিত-পরিবারে জন্মেছিলেন। তাঁর সময়ের লোকেরা মূর্তিপূজা করত, শাসকের পূজা করত, রাজা নমরূদের পূজা করত। ইবরাহীম (আ) এসব মেনে নিতে পারলেন না। তিনি ভাবলেন, হাতে গড়া মূর্তি মানুষের উপাস্য হতে পারে না। আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য এসব দেখে বললেন, এসবও মাবূদ হতে পারে না। কারণ এদেরও অস্ত আছে, ক্ষয় আছে এবং বিলুপ্তি আছে। এসব যিনি সৃষ্টি করেছেন এবং নিপুণভাবে পরিচালনা করছেন, তিনিই মাবূদ। আমরা সালাতে বা নামাযে দাঁড়িয়ে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সেই সিদ্ধান্তেরই পুনরাবৃত্তি করছি। আর বলছি, হে আসমান জমিনের সৃষ্টিকর্তা, তোমারই দিকে খাঁটিভাবে মুখ ফেরালাম। আমি মুশরিক নই, আমি তাওহীদে বিশ্বাসী।

আমরা তাওহীদের মর্ম জানব, বিশ্বাস স্থাপন করব এবং সে অনুযায়ী চলব।

কালিমা তায়্যিবা (كَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ)

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

[লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্]

অর্থ : "আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবূদ নেই, হযরত মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর রাসূল।"

তাৎপর্য

এই কালিমা তায়্যিবা বা পবিত্র বাক্য তাওহীদের মূলভিত্তি। এই কালিমাটি বিশ্লেষণ করলে তিনটি অংশ পাওয়া যায়।

প্রথম অংশ

'লা-ইলাহা' অর্থাৎ ইবাদাতের যোগ্য কেউই নেই।

এই না-বোধক বাক্য দ্বারা কালিমাটি শুরু করা হয়েছে। এর কারণ কী ? একটু চিন্তা করলেই আমরা বুঝতে পারি, যখন কোনো পাত্রে ভালো ও পবিত্র কিছু নিতে চাই, তখন পাত্রটিকে ভালো করে পরিষ্কার ও পবিত্র করে নিই। নোংরা পাত্রে ভালো জিনিস নিলে তাও খারাপ হয়ে যায়। রাসূল (স) যখন ইসলাম প্রচার শুরু করেন, তখন আরবের লোকেরা নানারকম কাল্পনিক দেবদেবীর উপাসনা ও শির্কের দ্বারা নিজেদের অন্তর অপবিত্র করেছিল। তাই এই না-বোধক ঘোষণা দ্বারা দেবদেবীর পূজা বাতিল করা হল। তাদের অন্তর শির্কের কলুষতা থেকে পবিত্র করা হল।

দ্বিতীয় অংশ

'ইল্লাল্লাহু' অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহ, এই বলে ইবাদাতের যোগ্য একমাত্র সত্তাকেই স্বীকার করা হয়। মুমিনের অন্তর আল্লাহর আর্‌শ। তিনি ছাড়া আর কারও স্থান সেখানে নেই। তিনি এক, অদ্বিতীয়। তাঁর কোনো শরীক নেই। মুমিন শুধু তাঁরই ইবাদাত করে। অন্য কারও সামনে মাথা নত করে না। এক আল্লাহর ইবাদাত মুমিনকে অন্য সবকিছুর দাসত্ব থেকে মুক্তি দেয়।

তৃতীয় অংশ

'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' বলে মুমিন মুহাম্মাদ (স)-কে সত্য নবী হিসেবে স্বীকার করে নেয়। আল্লাহকে বিশ্বাস করা যেমন জরুরি, আল্লাহর রাসূলকে বিশ্বাস করাও তেমনি জরুরি। রাসূলকে বিশ্বাস না করলে আল্লাহকেও বিশ্বাস করা হয় না। কারণ রাসূলের কাছেই আল্লাহর বাণী এসেছে। রাসূলের মাধ্যমেই আল্লাহর পরিচয় পাওয়া যায়। কালিমা তায়্যিবা — তাওহীদের এই মূল বাণী মানুষের চিন্তাজগতে এক বিরাট বিপ্লব এনে দেয়। মানুষকে একাধিক উপাস্য থেকে ফিরিয়ে এক আল্লাহর দিকে ধাবিত করাই এই বিপ্লবের মূলকথা।

আমরা কালিমা তায়্যিবা শুদ্ধভাবে পড়ব। এতে আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করব। আর এর মর্মানুসারে আমাদের জীবন গড়ে তুলব।

কালিমা শাহাদাত (كَلِمَةُ شَهَادَةٍ)

আশ্‌হাদু আল্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু	اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ
ওয়াহ্‌দাহু লা-শারীকা লাহূ	وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ
ওয়া আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান	وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا
আব্‌দুহু ওয়া রাসূলুহু।	عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

অর্থ : “আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবূদ নেই। তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই হযরত মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।”

তাৎপর্য

মহান আল্লাহ আমাদের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও বিধানদাতা। তিনি অতি দয়ালু। তিনি আমাদের অফুরন্ত নি‘আমত দান করেছেন। আলো, বাতাস, আগুন, পানি সবই আল্লাহ পাকের দান। তাঁর মেহেরবানিতে আমরা বেঁচে আছি। তিনি আমাদের খাদ্য দেন, সুখ দেন, শান্তি দেন। আমরা তাঁর দয়ার কথা, দানের কথা কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকার করি। তাঁর শোকর করি। তাঁরই ইবাদাত করি। তিনি আমাদের মাবূদ, আমরা তাঁর আবদ বা বান্দা। কালিমা শাহাদাতে আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমানের সাক্ষ্য দিই। একমাত্র তাঁকেই ইবাদাতের মালিক বলে আন্তরিকভাবে ঘোষণা করি। কালিমা মানে বাক্য, আর শাহাদাত মানে সাক্ষ্য দেওয়া। কালিমা শাহাদাত এমন বাক্য যা দ্বারা ঈমানের সাক্ষ্য দেওয়া হয়। কালিমা শাহাদাতে প্রধানত দুইটি অংশ আছে—

প্রথম অংশ

‘আশহাদু আল্ লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহূ’ দ্বারা তাওহীদের ঘোষণা করা হয়।

দ্বিতীয় অংশ

‘ওয়া আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু’ দ্বারা রিসালাতের স্বীকৃতি ও ঘোষণা দেওয়া হয়। আমরা আল্লাহ-কে চিনতাম না। নবী-রাসূলগণ মানুষের কাছে আল্লাহর পরিচয় তুলে ধরেছেন। তাঁকে খুশি করার পথ দেখিয়েছেন। তাঁরাই আমাদের আল্লাহ পাকের বাণী শুনিয়েছেন। আল্লাহর ইবাদাত করার নিয়ম শিখিয়েছেন। তাঁরা আল্লাহর বিধান পালন করে আমাদের হাতে কলমে শিক্ষা দিয়েছেন। হযরত মুহাম্মাদ (স) যেমন আল্লাহ তাআলার রাসূল, তেমনি তিনি আল্লাহর প্রিয় বান্দা। তিনিও মহান আল্লাহরই ইবাদাত করতেন। পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণ আল্লাহ পাকেরই ইবাদাত করতেন। কিন্তু মানুষ অনেক সময় নিজেদের মূর্খতার কারণে নবীগণকে অবতার ভেবে শির্ক করেছে।

ঈমান মুজমাল (إِيْمَانٌ مُّجْمَلٌ)

১.	আমানতু বিল্লাহি কামা হুয়া	اٰمَنْتُ بِا للّٰهِ كَمَا هُوَ
২.	বিআসমাইহী ওয়া সিফাতিহী	بِاَسْمَائِهٖ وَصِفَاتِهٖ
৩.	ওয়া কাবিলতু জামীআ	وَقَبِلْتُ جَمِيْعَ
৪.	আহকামিহী ওয়া আরকানিহী	اَحْكَامِهٖ وَاَرْكَانِهٖ

অর্থ : “আমি ঈমান আনলাম আল্লাহর ওপর ঠিক তেমনি, যেমন আছেন তিনি, তাঁর সব নাম ও গুণাবলিসহ। আর গ্রহণ করে নিলাম তাঁর সব হুকুম আহকাম ও বিধিবিধান।”

তাৎপর্য

ঈমান অর্থ বিশ্বাস। মুজমাল অর্থ সংক্ষিপ্ত। ঈমান মুজমাল মানে সংক্ষিপ্ত বিশ্বাস। ইসলামের মূল বিষয়গুলোকে সংক্ষেপে স্বীকার ও বিশ্বাস করাকে ঈমান মুজমাল বলে।

আল্লাহ মহান, তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই। তাঁর আছে সুন্দর গুণ, আছে কতগুলো সুন্দর সুন্দর নাম। আল্লাহর সত্তায় যেমন বিশ্বাস করতে হয়, তেমনি তাঁর সিফাত বা গুণাবলিতেও বিশ্বাস করতে হয়। আল্লাহ ও তাঁর গুণাবলিতে

বিশ্বাস করার পর তাঁর আহকাম ও আরকান গ্রহণ করতে হয়। অর্থাৎ আল্লাহর আদেশ-নিষেধগুলোও মেনে চলতে হয়। আমাদের জন্য যা কল্যাণকর তিনি তা আমাদের গ্রহণ করতে বলেছেন, আর যা অকল্যাণকর তা বর্জন করতে বলেছেন। এই গ্রহণ ও বর্জনের সমন্বয়ই ঈমান।

আমরা আল্লাহ পাকের আদেশ নিষেধ মেনে চলব। আমরা ঈমান মুজমাল শুদ্ধ উচ্চারণে পড়তে ও বলতে পারব। এর অর্থ ও বিষয়গুলো জানব এবং বলতে পারব। এতে বর্ণিত বিষয়গুলোর ওপর বিশ্বাস সম্পর্কে ব্যাখ্যা শিখব পারব এবং এগুলোর প্রতি যথাযথ বিশ্বাস করব।

আসমাউল হুসনা (اَلْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى)

আমরা জেনেছি, আল্লাহ পাক যেমন অতুলনীয় তেমনি তাঁর গুণাবলিও অতুলনীয়। তাঁর গুণের সাথে অন্য কারও গুণের তুলনা হয় না। আল্লাহ সকল গুণের আধার। তিনি খালিক –সৃষ্টিকর্তা। তিনি রাব্বুল আলামীন– মহাপ্রতিপালক। তিনিই সবকিছুর প্রকৃত মালিক। তিনি সবকিছু জানেন, তিনিই মহাবিজ্ঞ। তাঁর অনেকগুলো গুণবাচক নাম আছে। এগুলোকে বলা হয় 'আসমাউল হুসনা'। আসমা অর্থ নামসমূহ। আর হুসনা অর্থ সুন্দর সুন্দর। আসমাউল হুসনা অর্থ সুন্দর সুন্দর নাম। কুরআন মাজীদে আছে–

وَلِلّٰهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا ○

অর্থ : "আল্লাহর কতগুলো সুন্দর সুন্দর নাম আছে। তাঁকে সে নামগুলো দ্বারা ডাকো।"

কুরআন মাজীদে আল্লাহ পাকের অনেক গুণবাচক নামের উল্লেখ আছে। মানুষ আল্লাহর খলীফা বা প্রতিনিধি। মানুষের মধ্যে আল্লাহ পাক তাঁর নিজের গুণাবলির বিকাশ দেখতে চান। আল্লাহ্র গুণে গুণান্বিত হলে চরিত্র সুন্দর হয়। খুব ভালো মানুষ হওয়া যায়। আল্লাহ ন্যায়বিচারক। তিনি চান আমরাও ন্যায়বিচার করি। আল্লাহ ক্ষমাশীল। তিনি চান আমরাও যেন অন্যকে ক্ষমা করি। ইসলামে আল্লাহ্র গুণে গুণান্বিত হওয়ার নির্দেশ রয়েছে।

تَخَلَّقُوْا بِاَخْلَاقِ اللّٰهِ○

অর্থ : "তোমরা আল্লাহ্র গুণে গুণান্বিত হও।"

আমরা আল্লাহর গুণবাচক নামগুলো জানব। আল্লাহর গুণবাচক নামগুলো মানুষের জীবনের জন্য আদর্শ। আল্লাহর গুণ সম্পর্কে জানা থাকলে তাঁর আদেশমতো চলা সহজ হয়। অন্যায় থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব হয়। আমরা 'আসমাউল হুসনা'- এর মর্মানুসারে আমাদের জীবন গঠনে ব্রতী হব।

আল্লাহ মালিক (اَللّٰهُ مَالِكٌ)

মালিক শব্দের অর্থ অধিকারী। আল্লাহ সবকিছুর প্রকৃত মালিক। সবকিছুর অধিকারী। এই যে বিশাল পৃথিবী–এতে আছে নদীনালা, সাগর, মহাসাগর, পাহাড়-পর্বত। আছে ছোট বড় অনেক প্রাণী, জীবজন্তু, গাছপালা, ফুল ও ফসল। আমাদের মাথার উপর আছে নীল আকাশ। মহাকাশে আছে চন্দ্র, সূর্য, অসংখ্য গ্রহ-উপগ্রহ ও নক্ষত্র। পৃথিবীর চেয়ে লক্ষ লক্ষ গুণ বড় এক-একটি নক্ষত্র। কী বিশাল এ সৃষ্টি। আসমান যমীনে যা-কিছু আছে সবকিছুর মালিক একমাত্র আল্লাহ। তিনিই আমাদের জীবনমৃত্যুর মালিক। ধনসম্পদের মালিকও আল্লাহ। আমরা এসবের সাময়িক আমানতদার মাত্র।

আমরা আল্লাহ তাআলাকে আমাদের জানমালের মালিক বিশ্বাস করব। তাঁর নিআমতের শোকর করব এবং তাঁর নির্দেশিত পথে চলব।

আল্লাহ কারীম (اَللّٰهُ كَرِيْمٌ)

কারীম শব্দের অর্থ উদার, মহানুভব, মহামহিম, দয়াময় ইত্যাদি। দয়া, কৃপা, ক্ষমা, সহনশীলতা, মহানুভবতা, উদারতা প্রভৃতি গুণাবলির সমাবেশ পূর্ণমাত্রায় যে সত্তার মধ্যে বিদ্যমান তাঁকেই বলা হয় কারীম। আর এসবের সমাবেশ পূর্ণমাত্রায় একমাত্র আল্লাহ পাকের মধ্যেই বিদ্যমান। আল্লাহ কারীম মানে আল্লাহ মহানুভব,মহামহিম, উদার ও দয়াময়।

আল্লাহ পাকের দয়া ও দানের সাথে কারও তুলনা হয় না। চন্দ্র, সূর্য, আলো, বাতাস,আগুন, পানি, গাছপালা, জীবজন্তু এ সবকিছুই তিনি আমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তাঁর নি'আমত অফুরন্ত। আমরা তাঁর দয়াতেই বেঁচে আছি। এত সব নি'আমত ভোগ করেও আমরা তাঁর শোকর করি না। কিন্তু তবুও তিনি আমাদের সাথে সাথে শাস্তি দেন না। এ হচ্ছে তাঁর উদারতা, মহানুভবতা।

আল্লাহ আলীম (اَللّٰهُ عَلِيْمٌ)

আলীম শব্দের অর্থ সর্বজ্ঞ, সর্বজ্ঞানের অধিকারী। আল্লাহ পাক অসীম জ্ঞানের অধিকারী। তাঁর জ্ঞানের পরিমাপ করার মতো কিছুই নেই। আসমান জমিনের কোনোকিছুই তাঁর অজানা নয়।

আল্লাহ পাক আমাদের সমস্ত কর্মকাণ্ড ও গতিবিধি সম্বন্ধে অবগত আছেন। তিনি আমাদের অন্তরের খবরও জানেন। কুরআন মাজীদে আছে–

وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ○

অর্থ : "আল্লাহ অন্তরসমূহের খবর জানেন।"

অন্য সবাইকে ফাঁকি দিতে পারলেও সর্বজ্ঞ আল্লাহ তাআলাকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। আমরা অন্তরে যে চিন্তা করি তাও তিনি জানেন। তাঁর কাছে ভালোমন্দ কাজের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। সুতরাং আল্লাহ তাআলাকে হাযির নাযির জেনে আমরা আমাদের কাজকর্ম করব।

আলীম গুণের আদর্শে আমরা জ্ঞানার্জনে ব্রতী হব। জ্ঞানে গুণে আমাদের জীবন উন্নত করব। আল্লাহর দেওয়া জ্ঞান কল্যাণের কাজে ব্যবহার করে আমাদের এ পৃথিবীকে কল্যাণময় করে তুলব।

আল্লাহ হাকীম (اَللّٰهُ حَكِيْمٌ)

হাকীম শব্দের অর্থ মহাবিজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়, অত্যন্ত দক্ষ, সুনিপুণ, হিকমত ও কৌশলের অধিকারী। আল্লাহ হাকীম মানে আল্লাহ তাআলা মহাপ্রজ্ঞাময়। সুনিপুণ, হিকমত ও কৌশলের অধিকারী। তিনি অত্যন্ত নিপুণভাবে বিশ্বের সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং লালনপালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করছেন। চন্দ্র, সূর্য, তারকারাজির উদয়-অস্ত, রাত-দিনের আবর্তন, বাতাসের গতি পরিবর্তন, নদী-সাগরের জোয়ারভাঁটা, ফুল-ফলের বিচিত্র রং, রূপ, গন্ধ ও স্বাদ, জীব ও উদ্ভিদের জীবনমরণ–এ সবের মধ্যেই আল্লাহ পাকের হিকমতের পরিচয় ও প্রমাণ বিদ্যমান। আল্লাহর এই সুবিশাল সৃষ্টি, সুনিপুণ সৃষ্টিকৌশলের কথা ভাবলে আমরা বিস্মিত হই। শ্রদ্ধা ও আনুগত্যে তাঁর সামনে আমাদের মাথা নত হয়ে যায়।

আমরা মহাপ্রজ্ঞাময় আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করব। তাঁর গুণবাচক নামের আদর্শে আমাদের নিজেদের গড়ে তুলব এবং বিজ্ঞানমনস্ক ও বিজ্ঞানচর্চায় আগ্রহী হব।

আমরা আসমাউল হুসনার পরিচয় ও তাৎপর্য বর্ণনা করতে পারব। মালিক, কারীম, আলীম ও হাকীম– আল্লাহ পাকের এই গুণবাচক নামগুলোর অনুকরণে আমাদের জীবন গড়ে তুলব।

রিসালাত (رِسَالَةٌ)

মু'মিন হতে হলে যেমন তাওহীদে বিশ্বাস করতে হয় তেমনি রিসালাতেও বিশ্বাস করতে হয়। রিসালাতে বিশ্বাস না করলে তাওহীদে বিশ্বাস হয় না।

রিসালাতের পরিচয়

রিসালাত শব্দের অর্থ বার্তা, চিঠি বা সংবাদ বহন। রাসূলগণের দায়িত্বকে রিসালাত বলে। রিসালাতকে নবুওয়্যাতও বলা হয়।

নবী-রাসূলের পরিচয়

যে সকল মহাপুরুষ নবুওয়্যাত বা রিসালাতের পবিত্র দায়িত্ব পালন করতেন তাঁরা হলেন নবী-রাসূল। তাঁদের কাছে আল্লাহ পাকের বাণী আসত। তাঁরা নিজেরা আল্লাহর হুকুম পালন করে মানুষকে হাতে-কলমে শিক্ষা দিতেন। তাঁরা ছিলেন মানুষের মহান শিক্ষক। নবী-রাসূলগণ ছিলেন উত্তম চরিত্রের অধিকারী। তাঁরা ছিলেন সত্যবাদী।

তাঁরা কখনও মিথ্যা বলতেন না। তাঁরা ছিলেন নিষ্পাপ। তাঁদের মধ্যে লোভ-লালসা ছিল না। তাঁরা ছিলেন মানবদরদী। তাঁরা আজীবন কল্যাণের জন্য কাজ করেছেন। পৃথিবীতে অনেক নবী-রাসূল এসেছেন। তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রথম নবী হযরত আদম (আ)। আর সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)।

নবী ও রাসূলের মধ্যে পার্থক্য আছে। যাঁদের কাছে আসমানী কিতাব আসত তাঁরা হলেন রাসূল। আর যাঁদের কাছে আসমানী কিতাব আসত না তাঁরা নবী। অতএব, প্রত্যেক রাসূলই নবী, কিন্তু সকল নবী রাসূল নন। আসমানী কিতাব প্রাপ্ত নন এমন নবীগণ পূর্ববর্তী কিতাব অনুসারে দীন প্রচার করতেন।

রাসূল প্রেরণের প্রয়োজনীয়তা

১. নবী-রাসূলগণ আমাদেরকে আল্লাহর পরিচয় জানিয়েছেন।

২. কোনটি সঠিক পথ, কোনটি ভুল পথ, কোন পথ ভালো আর কোন পথ মন্দ আমরা তা জানতাম না। প্রিয় নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (স) আমাদের ভালোমন্দ পথের নির্দেশনা দিয়েছেন।

৩. নবী-রাসূলগণ নিজেরা আল্লাহর বিধান পালন করে মানুষদেরকে হাতে-কলমে শিক্ষা দিতেন।

৪. নবী-রাসূলগণ ছিলেন উন্নত চরিত্রের অধিকারী। তাঁরা মানুষের চরিত্র সংশোধনের জন্য ডাকতেন।

রিসালাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব

তাওহীদে বিশ্বাস করা যেমন জরুরি, রিসালাতে বিশ্বাস করাও তেমনি জরুরি। আল্লাহর বাণী আসত রাসূলগণের কাছে। রাসূলগণ তা মানুষের কাছে পৌঁছাতেন। রাসূলকে বিশ্বাস না করলে আল্লাহর বাণীকেও বিশ্বাস করা হয় না। আর আল্লাহর বাণী অবিশ্বাস করলে আল্লাহকেই অবিশ্বাস করা হয়। সুতরাং রিসালাতে বিশ্বাস করা ঈমানের অঙ্গ।

আমরা রিসালাতের অর্থ বলতে পারব। নবী-রাসূলের পরিচয় বলতে পারব। নবী-রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারব। রিসালাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব বুঝিয়ে বলতে পারব।

আমরা সকল নবী-রাসূলের প্রতি বিশ্বাস করব। তাঁদের প্রতি সম্মান দেখাব আর সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর জীবনাদর্শ মেনে চলব।

আখিরাত (آخِرَةٌ)

আখিরাত মানে পরকাল। ইহকালের পরের জীবনকে বলে পরকাল। মৃত্যুর পর থেকেই আখিরাতের জীবন। আখিরাতের জীবনের শুরু আছে, শেষ নেই। সে জীবন অনন্তকালের। মানুষ ইহকালে যেমন কাজ করবে, পরকালে তেমন তার ফল ভোগ করবে। মহানবী (স) বলেছেন, "দুনিয়া হল আখিরাতের শস্যক্ষেত্র।"

গুরুত্ব ও প্রভাব

তাওহীদ ও রিসালাতে বিশ্বাস করা যেমন জরুরি, আখিরাতে বিশ্বাস করাও তেমনি জরুরি। আখিরাতের বিশ্বাস মানবচরিত্রে খুব ভালো প্রভাব ফেলে। এ বিশ্বাস মানুষকে ইহকালের কাজকর্ম সম্বন্ধে সতর্ক ও সৎকর্মশীল করে তোলে। কারণ যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, ইহকালের ভালোমন্দ কাজের হিসাব পরকালে আল্লাহর কাছে দিতে হবে, জবাবদিহি করতে হবে, সে ব্যক্তি আল্লাহর শাস্তির ভয়ে মন্দকাজ থেকে বিরত থাকে । আর পুরস্কারের আশায় ভালো কাজে আগ্রহী হয়। এতে তার চরিত্র উন্নত হয়।

কবর

আখিরাতের জীবনের প্রথম ধাপ হল কবর বা আলমে বারযাখ। মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সময়কে বলে আলমে বারযাখ।

আলমে বারযাখে 'মুনকার নাকীর' নামে দুইজন ফেরেশতা তিনটি প্রশ্ন করবেন। যাদের কবর দেওয়া হয় না তারাও এ থেকে রেহাই পায় না। প্রশ্ন করা হবে রব (প্রভু), দীন ও রাসূল সম্বন্ধে। ইহজীবনে যারা আল্লাহ ও রাসূলের কথা মেনে চলবে তারা প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে পারবে। তাদের কবর হবে জান্নাতের মতোই সুখের স্থান।

যারা আল্লাহ ও রাসূলের কথামতো চলে না, তারা সে প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে পারবে না। তারা শুধু আফসোস করবে। তাদের কবর হবে অত্যন্ত কষ্টের স্থান। কবরেও তারা জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে।

কিয়ামত

এমন একসময় ছিল যখন বিশ্বজগৎ কিছুই ছিল না। আল্লাহ তাআলা সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। আবার এমন একসময় আসবে যখন মানুষ আল্লাহকে ভুলে যাবে, তাঁর নাম নেওয়ার মতো কেউ থাকবে না। তখন আল্লাহ বিশ্বজগৎ ধ্বংস করে দেবেন। একেই বলে কিয়ামত বা মহাপ্রলয়। কুরআন মাজীদে আছে—

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۝

অর্থ : "পৃথিবীর সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে।" (আর রাহমান : ২৬)

ইসরাফীল (আ)-এর প্রথম ফুঁকে সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। তাঁর দ্বিতীয় ফুঁকে মানুষ কবর থেকে এবং যে যেখানে আছে সেখান থেকে উঠবে। এই উত্থানকে কিয়ামত বলা হয়। একে মৃত্যুর পর পুনরুত্থানও বলা হয়ে থাকে।

হাশর

পুনরুত্থানের পর ভীত-শঙ্কিত জিন ও মানুষ একজন আহবানকারী ফেরেশ্‌তার ডাকে এক বিশাল ময়দানে সমবেত হবে। একে বলা হয় হাশর। হাশরে আল্লাহ পাকের সামনে দাঁড়িয়ে জীবনের সমস্ত কৃতকর্মের হিসাব দিতে হবে। ইহকালে যাঁরা ঈমান এনেছে, ভালো কাজ করেছে, তাঁরা আল্লাহর রহমত পাবে, আরামে থাকবে। আর যারা ঈমান আনেনি, ভালো কাজ করেনি, তাদের ভীষণ আযাব হবে। তাদের কষ্টের সীমা থাকবে না। সূর্য অতি নিকটবর্তী স্থান

থেকে সেদিন প্রচণ্ড প্রতাপে তাপ ঝরাতে থাকবে। পাপীরা সূর্যতাপে দহনে ভীষণভাবে ঘর্মাক্ত হতে থাকবে। সেদিন আল্লাহর আরশের ছায়া ব্যতীত কোনো ছায়া থাকবে না। পুণ্যবানরা আরশের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় লাভ করবে এবং আরামে থাকবে। হাশরের দিন মানুষ দুনিয়ার কৃতকর্মের খতিয়ান সংবলিত আমলনামা দেখতে পাবে। শুরু হবে অতি সূক্ষ্ম বিচার। স্বয়ং আল্লাহ হবেন বিচারক। নবী-রাসূল ও ফেরেশতাগণ হবে সাক্ষী। নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও সাক্ষ্য দিবে। হাশরের দিন মীযান দ্বারা পাপ-পুণ্যের ওজন করা হবে। যাদের পুণ্যের পাল্লা ভারী হবে, তারা জান্নাত লাভ করবে। আর যাদের পাপের পাল্লা ভারী হবে, তারা হবে জাহান্নামী। জান্নাত হল অকল্পনীয় সুখের স্থান আর জাহান্নাম হল অবর্ণনীয় দুঃখ-কস্ট ও আযাবের স্থান।

আমরা এ বিষয়গুলোর প্রতি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করব। আখিরাতের জবাবদিহিতার ভয়ে দুনিয়ার জীবন সম্বন্ধে সতর্ক হব। দুনিয়াতে শান্তি ও আখিরাতে মুক্তির উদ্দেশ্যে কাজ করব।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। তাওহীদ শব্দের অর্থ—
ক. বহুত্ববাদ খ. ত্রিতত্ত্ববাদ
গ. একত্ববাদ ঘ. রিসালাত

২। মানুষের কাছে আল্লাহর পরিচয় তুলে ধরেছেন—
ক. আউলিয়া দরবেশ খ. পীর-ফকীরগণ
গ. সাহাবায়ে কেরাম ঘ. নবী-রাসূলগণ

৩। মানুষ আল্লাহর খলিফা আর খলিফার কাজ হচ্ছে—
ক. প্রতিনিধিত্ব করা খ. রাজ্য শাসন করা
গ. সমাজসেবা করা ঘ. পাঞ্জাবি সেলাই করা

৪। রিসালাতের পবিত্র দায়িত্ব পালন করেন—
ক. হযরত জিব্রাইল (আ) খ. নবী–রাসূলগণ
গ. হযরত মুহাম্মাদ (স) ঘ. হযরত আদম (আ)

৫। কিয়ামত দিবসে হযরত ইসরাফীল (আ) যখন দ্বিতীয় ফুঁক দিবেন, তখন—
ক. সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে খ. মানুষ কবর থেকে উঠে আসবে
গ. বিচারকাজ শুরু হবে ঘ. পাহাড়গুলো তুলার মতো উড়বে

নিচের তথ্যের আলোকে ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

অহিদুল ইসলাম একটি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তার মনের ভেতরে একটি গভীর ভাবনা এল: কবরে মৃত ব্যক্তিটি কী অবস্থায় আছে ? মৃত্যু হওয়ার পর আমার কী অবস্থা হবে ? তার মনে পড়ল, তার এক বন্ধু লঞ্চডুবিতে মারা যায়, কিন্তু তাকে আর কবর দেয়া সম্ভব হয়নি।

৬। কবরে মানুষকে প্রশ্ন করা হবে –
ক. ৫টি খ. ৭টি
গ. ২টি ঘ. ৩টি

৭। যাদেরকে কবর দেয়া সম্ভব হয়নি–
ক. তারা বেহেশতের সুখ লাভ করবে
খ. অন্যদের মতো তাদেরকেও প্রশ্ন করা হবে
গ. তাদের অপরাধ আল্লাহ্ ক্ষমা করে দিবেন
ঘ. তারা কিয়ামত পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকবে

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। চাকরিজীবী রফিক সাহেব বলেন: চাকরির কারণেই আমি বাড়ি গাড়ি সবকিছুই করেছি। শফিক সাহেব বললেন: আমার বাবা চাকরি করে বাড়ি গাড়ি করতে পারেননি। আমি আল্লাহর সাহায্যেই ব্যবসায় উন্নতি করেছি এবং বাড়ি গাড়ি করতে পেরেছি। আল্লাহ আমাদের অফুরন্ত নিআমত দান করেছেন। প্রকৃতপক্ষে সম্মান, সুখ, শান্তি, সবকিছু আল্লাহর মেহেরবানিতে হয়। আসলে চাকরি বা ব্যবসায় এগুলো অর্জিত হয় না। এ সবকিছুর মূল বিশ্বাস হল– লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

ক. লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ– অর্থ কী ?
খ. আল্লাহ মানুষকে আহার দেন– বুঝিয়ে লেখ।
গ. আকাইদের দৃষ্টিতে শফিক সাহেব ও রফিক সাহেবের ধারণা ব্যাখ্যা কর।
ঘ. 'সবকিছু আল্লাহর মেহেরবানিতে হয়'–বিষয়টির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

২। সুযোগ পেলেই আরিফ অন্যের জিনিস চুরি করে। এ নিয়ে মানুষ আরিফের বাবাকে অভিযোগ করলে তিনি খুব কষ্ট পান এবং ছেলেকে ডেকে বলেন: দুনিয়ার ভালো–মন্দ কাজের জন্য আমাদেরকে আল্লাহর বিচারের সম্মুখীন হতে হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি একখানা হাদীস শোনান–'দুনিয়া আখিরাতের শস্যক্ষেত্র'।

ক. আখিরাত শব্দের অর্থ কী ?
খ. 'দুনিয়া আখিরাতের শস্যক্ষেত্র'– সংক্ষেপে বুঝিয়ে লেখ।
গ. কীভাবে আরিফের চুরি করার অভ্যাসটি সংশোধন করা যায় ?
ঘ. আখিরাতের বিশ্বাস আমাদের চরিত্রকে সুন্দর করে—আলোচনা কর।

৩। আবু ছালেহ একজন মেধাবী ছাত্র। সে সকল বিষয়ে জানতে আগ্রহী। একদিন সে তার পাঠ্যবইয়ে কালিমার অর্থ পড়ল: "আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই। হযরত মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর রাসূল।" প্রসঙ্গক্রমে তাঁর বাবা রিসালাতের গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং যুগে যুগে নবী-রাসূলগণের আগমনের কারণ বর্ণনা করেন।

ক. রিসালাতের অর্থ কী ?
খ. নবী ও রাসূলের মধ্যে পার্থক্য কী ? বুঝিয়ে লেখ।
গ. একজন মুসলমান হিসেবে আবু সালেহকে রিসালাতে বিশ্বাস করা গুরুত্বপূর্ণ কেন ?
ঘ. আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই। হযরত মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর রাসূল—এ কালিমাটি ব্যাখ্যা কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইবাদাত (عِبَادَةٌ)

আল্লাহ তাআলা আমাদের সৃষ্টি করেছেন। তিনিই আমাদের লালনপালন করেন। তিনিই আমাদের রব। আমরা তাঁর বান্দা। আমাদের জীবন-মরণ তাঁর হাতে। তিনি আমাদের জন্য এই মহাবিশ্বকে কত সুন্দর করে সাজিয়েছেন। আসমান-জমিন, চাঁদ-সুরুজ, ফল-ফুল, নদী-নালা সব আমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আমরা সব ভোগ করি। আমাদেরকে সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে তৈরি করেছেন। আল্লাহর দেওয়া অফুরন্ত নিআমত ভোগ করার পর এর শুক্‌রিয়া আদায় করতে হবে। নিআমতের শুক্‌রিয়া আদায় করে আল্লাহর দেওয়া বিধানমতো চলার নামই ইবাদাত। আমরা আল্লাহর হুকুমমতো চলব এবং তাঁরই ইবাদাত করব।

ইবাদাত আরবি শব্দ। এর অর্থ দাসত্ব ও আনুগত্য। আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্যই হল ইবাদাত। ইসলামী পরিভাষায় আল্লাহর সকল আদেশ-নিষেধ মেনে চলার নামই ইবাদাত। আল্লাহ তাআলা সকল জিনিস মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আর জিন ও মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদাতের জন্য। এ সম্পর্কে কুরআন পাকে ইরশাদ হচ্ছে—

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ ○

অর্থ : "আর আমি জিন ও মানবজাতিকে কেবল আমার ইবাদাতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।" (সূরা যারিয়াত : ৫৬)
নবী কারীম (স) ইবাদাত সম্পর্কে বলেছেন-

مَنْ دَلَّ عَلٰى خَيْرٍ فَلَهٗ مِثْلُ اَجْرِ فَاعِلِهٖ ○

অর্থ: "যে ব্যক্তি কোনো ভালো কাজের পরামর্শ বা সন্ধান দেবে, সে ঐ কাজটি সম্পাদনকারীর সমান সাওয়াব পাবে।" (মুসলিম)

আমরা ভালো কাজ করব। অন্যকে সৎকাজের পরামর্শ দেব। আমাদের পরামর্শ পেয়ে তারা ভালো কাজ করবে, সাওয়াব পাবে। আমরাও তাদের সমান সাওয়াব পাব। আমাদের জন্য সালাত, সাওম, হাজ্জ ও যাকাত ইত্যাদি কতগুলো নির্ধারিত ইবাদাত রয়েছে। এগুলো নবী কারীম (স) যেভাবে আদায় করেছেন, আমাদেরকে করতে বলেছেন, আমরা ঠিক সেভাবেই আদায় করব। এই ইবাদাতগুলোকে তিন ভাগ করা যায়—

১. ইবাদাতে বাদানী বা শারীরিক ইবাদাত।

২. ইবাদাতে মালী বা আর্থিক ইবাদাত।

৩. ইবাদাতে মালী ও বাদানী বা শরীর ও অর্থ উভয়ের সংমিশ্রণে ইবাদাত।

শারীরিক ইবাদাত

শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাহায্যে যে ইবাদাত করা হয় তাকে বলা হয় ইবাদাতে বাদানী বা শারীরিক ইবাদাত। যথা- দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা ও রমযান মাসে সাওম বা রোযা রাখা। ইবাদাতের মধ্যে শারীরিক ইবাদাত সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

আর্থিক ইবাদাত

অর্থের দ্বারা যে ইবাদাত করতে হয় সেগুলোকে বলা হয় ইবাদাতে মালী বা আর্থিক ইবাদাত। যেমন—যাকাত দেওয়া, সাদকা ও দান-খয়রাত করা ইত্যাদি।

শরীর ও অর্থ উভয়ের সংমিশ্রণে ইবাদাত

উল্লিখিত দুই প্রকার ইবাদাত ছাড়াও এমন কিছু ইবাদাত আছে যা শুধু শরীর দ্বারা বা কেবল অর্থ দ্বারা করা যায় না। বরং শরীর এবং অর্থ উভয়ের প্রয়োজন। যেমন হাজ্জ করা, জিহাদ করা ইত্যাদি।

আল্লাহ তাআলা যেহেতু আমাদের ইবাদাতের জন্যই সৃষ্টি করেছেন, কাজেই সর্বক্ষণ তাঁর ইবাদাতে মশগুল থাকা আমাদের কর্তব্য। এখন প্রশ্ন জাগতে পারে যে, সর্বক্ষণই কি ইবাদাত করা সম্ভব ? হ্যাঁ, দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা ইবাদাত করা সম্ভব। যেমন আমরা খেতে বসলে যদি বিসমিল্লাহ বলে খাওয়া শুরু করি, তবে যতক্ষণ খাওয়ার মধ্যে থাকব ততক্ষণ আল্লাহর রহমত পেতে থাকব। এটিই ইবাদাত। পড়ার সময় যদি বিসমিল্লাহ বলে পড়া শুরু করি তবে যতক্ষণ পর্যন্ত লেখাপড়া করব, ততক্ষণই ইবাদাতে গণ্য হবে। স্কুলে যাবার সময় বিসমিল্লাহ বলে যাত্রা শুরু করলে রাস্তার সকল বিপদাপদ থেকে আল্লাহ আমাদের হেফাযত করবেন। রাস্তার একটি অন্ধলোক রাস্তা পার হতে পারছে না, তাকে হাত ধরে পার করে দিলে তাও আল্লাহর নিকট ইবাদাত বলে গণ্য হবে। এমনিভাবে সর্বক্ষণ ইবাদাতে আমরা মশগুল থাকতে পারি। ইবাদাত করলে আল্লাহ খুশি হন। এতে দুনিয়ার জীবন সুখময় হয়। পরকালে পরম শান্তিময় স্থান জান্নাত লাভ করা যায়। আর যারা ইবাদাত করে না, আল্লাহর নির্দেশিত পথে চলে না, আল্লাহ তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হন। তারা দুনিয়াতে শান্তি পায় না। পরকালেও তাদেরকে জাহান্নামের কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে।

পবিত্রতা (طَهَارَةٌ)

ইবাদাতের জন্য পাকপবিত্র থাকা প্রয়োজন। পাকসাফ না হয়ে সালাত আদায় করা যায় না। অপবিত্র অবস্থায় কুরআন মাজীদ স্পর্শ করা নিষেধ। কাজেই আমাদের পাক-পবিত্র থাকা প্রয়োজন।

তাহারাত অর্থ পবিত্রতা। যেমন ওযু করা, গোসল করা ইত্যাদি। পবিত্রতা ছাড়া ইবাদাত কবুল হয় না। পবিত্র থাকলে শরীর সুস্থ থাকে, মন প্রফুল্ল থাকে, লেখাপড়া কাজকর্মে মন বসে। পবিত্রতা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে বলেন–

وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ۝

অর্থ : "যারা পাকসাফ এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ভালোবাসেন।" (তাওবা : ১০৮)

মহানবী (স) বলেন–

اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ۔

অর্থ : "পাক পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক।"

কেবল বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতা থাকলে চলবে না। শরীর, পোশাক পরিষ্কার রাখার সাথে সাথে মন ও পরিবেশ পরিষ্কার রাখতে হবে।

নাজাসাত (نَجَاسَةٌ)

নাজাসাত অর্থ অপবিত্রতা, মলিনতা। এটি হল তাহারাতের বিপরীত। নাজাসাত দুই প্রকার: ১. নাজাসাতে হাকীকী ২. নাজাসাতে হুকমী।

নাজাসাতে হাকীকী

নাজাসাতে হাকীকী হচ্ছে ঐ সকল নাপাক বস্তু যাতে মানুষের মনে স্বভাবত ঘৃণা আসে। প্রত্যেকে এগুলো থেকে নিজের শরীর, জামাকাপড় ও অন্যান্য ব্যবহারের জিনিসপত্র বাঁচিয়ে রাখতে চায়। ইসলাম এসব থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছে। যেমন– পেশাব-পায়খানা, রক্ত ইত্যাদি।

নাজাসাতে হুকমী

নাজাসাতে হুকমী ঐসব নাজাসাত যা দেখা যায় না, কিন্তু ইসলামী বিধানে তা নাজাসাত বলে গণ্য। যেমন– ওযূ ভঙ্গ হওয়া, গোসলের প্রয়োজন হওয়া ইত্যাদি।

পবিত্রতা অর্জনের অনেক নিয়ম আছে। ওযূ তার মধ্যে একটি উত্তম নিয়ম। ওযূ ছাড়া সালাত আদায় হয় না, কুরআন মাজীদ স্পর্শ করা যায় না। আমরা সালাতের আগে ওযূ করে নেব।

ওযূ (اَلْوُضُوْءُ)

শরীর পবিত্র করার নিয়্যাতে পাক পানি দিয়ে শরীআতের নিয়ম মোতাবেক নির্দিষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধোয়ার নামই ওযূ। ওযূর গুরুত্ব বর্ণনা করে কুরআন পাকে বলা হয়েছে– "যারা ঈমান এনেছ জেনে রেখো, যখন তোমরা সালাতের জন্য দাঁড়াবে তার আগে নিজেদের মুখমণ্ডল ধুয়ে নেবে, তোমাদের দুই হাত কনুই পর্যন্ত ধুয়ে নেবে, মাথা মাসেহ্ করবে এবং উভয় পা গিরাসহ ধুয়ে নেবে।" (মায়িদাহ : ৬)

নবী কারীম (স) বলেন, "আমি কিয়ামতের দিন আমার উম্মতকে চিনতে পারব।" জনৈক সাহাবী বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল (স)! কোটি কোটি মানুষের মধ্যে আপনি কীভাবে আমাদের চিনবেন ?" নবীজী বললেন, "ওযূর ফলে আমার উম্মতের মুখমণ্ডল এবং হাত-পা উজ্জ্বলতায় ঝকঝক করবে। তাতেই আমি আমার উম্মতকে চিনতে পারব।" কাজেই এই ফযিলত পাবার আশায় আমাদের অতি উত্তমরূপে ওযূ করতে হবে।

ওযূর নিয়ম

মনে মনে পবিত্রতা হাসিলের নিয়্যাত করে বিস্‌মিল্লাহ বলে প্রথমে দুই হাত কব্জি পর্যন্ত ধুয়ে তারপর ডান হাতে পানি নিয়ে তিনবার কুলি করতে হবে। রোযা না থাকলে তিনবারই গড়গড়া করে কুলি করতে হবে। এরপর নাকে পানি দিয়ে তিনবার নাক সাফ করতে হবে। তারপর তিনবার সমস্ত মুখমণ্ডল এমনভাবে ধুতে হবে যাতে চুল পরিমাণ স্থান শুকনো না থাকে। দাড়ি ঘন হলে খিলাল করতে হবে। এরপর দুই হাত কনুই পর্যন্ত ধুয়ে নিতে হবে। হাতে আংটি থাকলে বা মেয়েদের হাতে চুড়ি থাকলে তা নাড়াচাড়া করতে হবে যেন সবখানে পানি পৌঁছে যায়। তারপর দুই হাত ভিজিয়ে মাথা এবং কান মাসেহ্ করতে হবে। মাসেহ্ করার সময় দুই হাতের বুড়ো এবং শাহাদাত অঙ্গুলি আলাদা রেখে বাকি তিন তিন অঙ্গুলি মিলিয়ে অঙ্গুলিগুলোর ভিতর দিক দিয়ে কপালের চুলের গোড়া থেকে পেছনদিকে মাথার এক-চতুর্থাংশ মাসেহ্ করতে হবে। তারপর দুই হাতের তালু পেছনদিক থেকে সামনের দিকে টেনে মাথার এক-চতুর্থাংশ মাসেহ্ করতে হবে। এরপর শাহাদাত অঙ্গুলি দিয়ে হাতের অঙ্গুলিগুলোর পিঠ দিয়ে ঘাড় মাসেহ্ করতে হবে। মাসেহ্ করার পর দুই টাখনু পর্যন্ত ভালো করে ধুতে হবে যাতে একটু জায়গাও বাকি না থাকে।

ওযূর কাজগুলো পর পর করে যেতে হবে। অর্থাৎ একটার পর একটা সঙ্গে সঙ্গে ধুতে হবে। অনেকক্ষণ থেমে থেমে করা যাবে না।

তায়াম্মুম (اَلتَّيَمُّمُ)

ওযূ কিংবা গোসলের প্রয়োজনে পবিত্র পানি পাওয়া না গেলে অথবা শারীরিক অসুস্থতার কারণে পানি ব্যবহারে অক্ষম হলে পবিত্র মাটি বা ঐজাতীয় পবিত্র বস্তু (যেমন–পাথর, চুনা, বালু ইত্যাদি) দিয়ে শরীর পাক করাকে তায়াম্মুম বলে।

তায়াম্মুম করার নিয়ম

পবিত্রতা হাসিলের নিয়্যাতে প্রথমে পাক মাটিতে দুই হাত লাগিয়ে সমস্ত মুখমণ্ডল একবার মাসেহ্ করা। পুনরায় মাটিতে দুই হাত মেরে উভয় হাত কনুই পর্যন্ত মাসেহ্ করা। তায়াম্মুমে নিয়্যাত করা ফরয।

গোসল (غُسْلٌ)

গোসলের আভিধানিক অর্থ ধৌত করা। শরীআতের নিয়ম মোতাবেক নাপাকী দূর করার উদ্দেশ্যে সমস্ত শরীর ধোয়াকে গোসল বলে।

গোসলের নিয়ম

প্রথমে ডান হাতে পানি নিয়ে দুই হাত কব্জি পর্যন্ত ভালো করে ধুতে হবে। তারপর শরীরের কোথাও নাজাসাত লেগে থাকলে তা পরিষ্কার করতে হবে। এরপর দুই হাত ভালোভাবে ধুয়ে ওযূ করতে হবে। কুলি করার সময় কণ্ঠদেশে এবং নাকের ভিতর পানি ভালো করে পৌঁছাতে হবে। ওযূর পর মাথায় পানি ঢালতে হবে। এরপর ডান কাঁধে, তারপর বাম কাঁধে পানি ঢেলে সমস্ত শরীর ভালো করে ঘষতে হবে যেন শরীরের কোনো অংশ শুকনো না থাকে এবং শরীর ভালোভাবে পরিষ্কার হয়। এরপর শরীরে দুইবার এমনভাবে পানি ঢালতে হবে যেন কোনো স্থান শুকনো থাকার আশঙ্কা না থাকে। ওযূর সময় পা না ধুয়ে থাকলে এখন পা ধুতে হবে। সবশেষে সমস্ত শরীর কোনো কাপড় বা গামছা দিয়ে মুছে শুকনো কাপড় পরতে হবে। মেয়েদের জন্য খোঁপা বা বেণী খোলার প্রয়োজন নেই, তবে চুলের গোড়ায় অবশ্যই পানি পৌঁছাতে হবে।

এ পাঠ থেকে আমরা—

১.	তাহারাত ও নাজাসাতের ব্যাখ্যা করতে পারব।
২.	তাহারাতের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারব।
৩.	ওযূ, গোসল ও তায়াম্মুম করার নিয়ম বলতে পারব।
৪.	নিয়মিত ওযূ, গোসলের মাধ্যমে পাকপবিত্র থাকতে অভ্যস্ত হব।

সালাত (اَلصَّلٰوةُ)

আল্লাহর নিকট বান্দার আনুগত্য প্রকাশের যত নিয়ম আছে তার মধ্যে সালাত সর্বশ্রেষ্ঠ। কালিমা, সালাত, সাওম, হাজ্জ ও যাকাত-ইসলামের এই পাঁচটি রুকন্ বা স্তম্ভের মধ্যে সালাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সালাতের আভিধানিক অর্থ নামায পড়া, দুআ করা, স্থায়ীভাবে সরলপথে থাকা। ইসলামের পরিভাষায়: আরকান আহকামসহ বিশেষ নিয়মে আল্লাহর ইবাদাতের নাম সালাত। সালাতের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ তাআলার সবচেয়ে নৈকট্য লাভ করতে পারে। সালাত মানুষকে অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন–

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ۝

অর্থ : "নিশ্চয়ই সালাত মানুষকে অশ্লীলতা ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে।" (আনকাবুত : ৪৫)

মহানবী (স) এ সম্পর্কে বলেন– কোনো বান্দা পাঁচ ওয়াক্ত সালাত জামাআতের সাথে আদায় করলে আল্লাহ তাআলা পাঁচটি পুরস্কার দেবেন।

১.	তার জীবিকার অভাব দূর করবেন।	৪.	পুলসিরাত বিজলির মতো তাড়াতাড়ি পার করাবেন।
২.	কবরের আযাব থেকে মুক্তি দেবেন।	৫.	বিনা হিসাবে জান্নাত দান করবেন।
৩.	হাশরে আমলনামা ডান হাতে দেবেন।		

সালাতের গুরুত্ব সম্পর্কে নবী কারীম (স) বলেন- اَلصَّلٰوةُ عِمَادُ الدِّيْنِ-

অর্থ : "সালাত দীন ইসলামের খুঁটিস্বরূপ।"

যে সালাত কায়েম করল সে তাঁর দীনরূপ ইমারতটি ঠিক রাখল। আর যে সালাত ত্যাগ করল সে তার দীন ইমারতটি ভেঙ্গে ফেলল।

নবীজী বলেছেন: – اَلصَّلٰوةُ مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ "সালাত জান্নাতের চাবি।" কারও হাতে কোনো ঘরের চাবি থাকলে যেমন অতি সহজেই সে ঘরে প্রবেশ করতে পারে, তেমনি যে ব্যক্তি সালাত কায়েম করে সে অতি সহজেই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।

> আমরা সালাতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বর্ণনা করতে পারব। দুনিয়ার শান্তি ও পরকালের মুক্তির জন্য যথাযথভাবে সালাত কায়েম করব।

সালাতের সময়সূচি (اَوْقَاتُ الصَّلٰوةِ)

সময়মতো সালাত আদায় করা আল্লাহর হুকুম। যথাসময়ে আদায় না করলে সালাত আদায় হয় না। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন– "নিশ্চয়ই সঠিক সময়ে সালাত কায়েম করা মুমিনের ফরয।" (নিসা : ১০৪)

ওয়াক্ত

সালাত কায়েমের সময় সম্পর্কে আমাদের ভালোভাবে জেনে নিতে হবে। নিচে সালাতের ওয়াক্তের বিবরণ দেওয়া হল–

ফজর ফজরের সালাতের সময় আরম্ভ হয় সুবহি-সাদিক হওয়ার সাথে সাথে এবং সূর্য উদয়ের পূর্ব পর্যন্ত এর সময় থাকে। আকাশের পূর্ব দিগন্তে লম্বমান যে আলোর রেখা দেখা দেয় তাকেই বলে সুবহি-সাদিক। এই আলো ক্রমশ বৃদ্ধি পায় এবং শেষে সূর্যোদয় ঘটে।

যুহ্‌র দ্বিপ্রহরের পর সূর্য পশ্চিমআকাশে হেলে পড়লেই যুহ্‌রের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং প্রত্যেক বস্তুর ছায়া 'ছায়া আসলি' বাদ দিয়ে দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত এই সময় থাকে। কোনো বস্তুর ঠিক দুপুরের সময়ে যে একটু ছায়া থাকে তাকেই 'ছায়া আস্‌লি' বা আসল ছায়া বলে। যেমন এক হাত লম্বা একটি কাঠির আসল ছায়া দুপুরবেলা চার আঙুল ছিল। তারপর যখন ঐ কাঠির ছায়া দুই হাত চার আঙুল হবে তখন যুহ্‌রের ওয়াক্তও শেষ হয়ে যাবে।

আসর যুহ্‌রের সময় শেষ হলেই আসরের সময় শুরু হয় এবং সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত থাকে। তবে সূর্যের বর্ণ হলুদ রং ধারণ করলে আসরের সালাত আদায় করা মাকরূহ।

মাগরিব সূর্যাস্তের পর থেকে মাগরিবের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং পশ্চিমআকাশে যতক্ষণ লালিমা থাকে ততক্ষণ সময় থাকে। মাগরিবের সময় খুবই কম। তাই সময় হওয়ার সাথে সাথেই সালাত আদায় করে নেওয়া উত্তম।

ইশা মাগরিবের সময় শেষ হওয়ার পর ইশার সালাতের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং সুবহি-সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত থাকে। তবে রাতের প্রথম প্রহরের মধ্যে আদায় করা উত্তম। রাত দ্বিপ্রহরের পর আদায় করা মাক্‌রূহ।

বিতর বিতর-এর আসল সময় শেষরাত। তবে ইশার সালাতের সাথেও আদায় করা যায়। কিন্তু ইশার আগে পড়া যায় না।

নিম্নে সালাতের সময়সূচির একটি সংক্ষিপ্ত চার্ট দেওয়া হল—

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
১. ফজর	সুবহি-সাদিকের পর থেকে	সূর্য উদয়ের পূর্ব পর্যন্ত।
২. যুহ্‌র	সূর্য পশ্চিমআকাশে হেলে যাওয়ার পর থেকে	কোনো বস্তুর ছায়া, আসল ছায়া ব্যতীত দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত।
৩. আসর	যুহ্‌রের ওয়াক্ত শেষ হলে।	সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত।
৪. মাগরিব	সূর্যাস্তের পর থেকে	পশ্চিমাকাশে লালিমা থাকা পর্যন্ত।
৫. ইশা	মাগরিবের ওয়াক্ত শেষ হলে।	সুবহি-সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত।
৬. বিতর	ইশার পর থেকে	সুবহি-সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত।

সালাতের নিষিদ্ধ সময়

তিন সময় সালাত পড়া নিষেধ :

১. ঠিক সূর্যোদয়ের সময়।

২. ঠিক দ্বিপ্রহরের সময়।

৩. সূর্যাস্তের সময়। তবে কোনো কারণে ঐ দিনের আসরের সালাত আদায় করা না হলে তা ঐ সময় আদায় করা যাবে কিন্তু মাকরূহ হবে।

সালাতের মাকরূহ সময়

নিচে বর্ণিত সময়ে পূর্বের কোনো ওয়াক্তের ফরয্ ও ওয়াজিব কাযা ব্যতীত অন্য সালাত পড়া মাকরূহ।

১. ফজরের সালাতের পর সূর্য উদয় না হওয়া পর্যন্ত। ২. আসরের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত। ৩. ফজরের সময় হলে ঐ ওয়াক্তের সুন্নাত ছাড়া অন্য কোনো সালাত পড়া। ৪. ফরয সালাতের যখন তাকবির দেওয়া হয় তখন অন্য সালাত শুরু করা।	৫. মাগরিবের সময় ঐ ওয়াক্তের ফরযের আগে। ৬. যখন ইমাম জুমআর খুতবা দিতে থাকেন তখন। ৭. ইশার সালাত মধ্যরাতের পরে পড়া।

সালাতের মুস্তাহাব সময়

সালাতের মুস্তাহাব বা উত্তম সময় হল–

১. ফজরের সালাত ফর্সা হওয়ার পর আদায় করা।

২. যুহ্‌রের সালাত গরমের দিনে সূর্যের তাপ কিছুটা কমলে অর্থাৎ কিছুক্ষণ বিলম্ব করে পড়া।

৩. মাগরিবের সালাত সময় হওয়ার সাথে সাথে আদায় করা।

৪. ইশার সালাত রাতের প্রথমে এক-তৃতীয়াংশের মধ্যে পড়া।

সালাত আদায়ের নিয়ম

সব কাজের একটি নিয়ম আছে। নিয়মমতো কাজ করলে সুফল পাওয়া যায়। সালাত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত, যা মহানবী (স) আমাদেরকে বাস্তব আমল দ্বারা শিখিয়েছেন।

কোনোপ্রকার ভুল হলে সালাতের ক্ষতি হয়, গুনাহ হয়। ভুল সালাত আল্লাহ তাআলা কবুল করেন না। দুই, তিন ও চার রাকা'আত বিশিষ্ট সালাত আদায়ের নিয়মের কিছুটা তারতম্য আছে। নিচে এর পূর্ণ বিবরণ দেওয়া হল।

দুই রাকা'আত বিশিষ্ট সালাত আদায়ের নিয়ম

সালাত আদায়ের ইচ্ছা করলে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে যে,সালাতের শর্তগুলোর কোনোটাই যেন বাদ না পড়ে। পাকপবিত্র হয়ে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করতে হবে। মনে করতে হবে যে, আমি আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে আছি। তিনি আমাকে দেখছেন। কিবলামুখী হয়ে নিয়্যাত করে দুই হাত কাঁধ পর্যন্ত তুলে "আল্লাহু আকবার" বলে নাভির উপর হাত বাঁধব। স্ত্রীলোকগণ হাত বাঁধবে বুকের উপর। নিয়্যাত মনে মনে করলেই চলবে। তবে মুখে উচ্চারণ করা উত্তম। এরপর "সানা" পড়ব। এরপর আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম বলে সূরা ফাতিহা পড়ব। ফাতিহা পড়ে মনে মনে "আমীন" বলব। এরপর অন্য কোনো সূরার কমপক্ষে বড় এক আয়াত অথবা ছোট তিন আয়াত কিংবা একটি সূরা পড়ব। তারপর "আল্লাহু আকবার" বলে রুকূ করব। রুকূতে কমপক্ষে তিনবার "সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম" বলব। তারপর "সামি আল্লাহুলিমান হামিদাহ্" বলে সোজা হয়ে দাঁড়াব। দাঁড়ানো অবস্থায় "রাব্বানা লাকাল হাম্‌দ" বলব। তারপর "আল্লাহু আকবার" বলে সিজদাহ করব। সিজদায় অন্তত তিনবার "সুবহানা রাব্বিয়াল আলা" বলব। তারপর "আল্লাহু আকবার" বলে সোজা হয়ে বসব। আবার "আল্লাহু আকবার" বলে দ্বিতীয় সিজদাহ করব। এবারও সিজদায় কমপক্ষে তিনবার "সুবহানা রাব্বিয়াল আলা" বলব। এরপর "আল্লাহু আকবার' বলে সোজা হয়ে দাঁড়াব। এভাবে প্রথম রাকা'আত শেষ হবে।

এখন দ্বিতীয় রাকা'আত শুরু হল। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম বলে সূরা ফাতিহা পড়ব। তারপর পূর্বের মতো সূরা মিলাব। তারপর প্রথম রাকা'আতের মতো রুকূ ও সিজদাহ করে সোজা হয়ে বসব। তাশাহহুদ,দরূদ ও দুআ মাসূরা পড়ে ডানে ও বামে মুখ ফিরিয়ে "আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ" বলব। এইভাবে দুই রাকা'আত বিশিষ্ট সালাত শেষ হবে।

তিন রাকা'আত বিশিষ্ট সালাত আদায়ের নিয়ম

তিন রাকা'আত বিশিষ্ট ফরয সালাতে দ্বিতীয় রাকা'আতের পর শুধু তাশাহ্হুদ পড়ব। তারপর তাকবীর বলে সোজা হয়ে দাঁড়াব। এরপর বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম বলে শুধু সূরা ফাতিহা পড়ব। অন্য কোনো সূরা পড়ব না। এরপর পূর্বের মতো রুকূ সিজদাহ করব। সিজদার পর সোজা হয়ে বসে তাশাহ্হুদ, দরূদ ও দুআ মাসূরা পড়ে ডানে-বামে সালাম ফিরিয়ে সালাত শেষ করব।

চার রাকা'আত বিশিষ্ট সালাত আদায়ের নিয়ম

চার রাকা'আত বিশিষ্ট ফরয সালাতে দ্বিতীয় রাকা'আতের পর শুধু তাশাহ্হুদ পড়ব। পরে তৃতীয় রাকা'আতের জন্য তাকবীর বলে উঠে দাঁড়াব। এরপর বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম বলে শুধু সূরা ফাতিহা পড়ব। তারপর রুকূ সিজদাহ করে চতুর্থ রাকা'আতের জন্য উঠে দাঁড়াব। চতুর্থ রাকা'আতে তৃতীয় রাকা'আতের মতো সূরা ফাতিহা পড়ে রুকূ, সিজদাহ করার পর বসে তাশাহ্হুদ, দরূদ ও দুআ মাসূরা পড়ে ডানে-বামে সালাম ফিরিয়ে সালাত শেষ করব। সালাত ওয়াজিব, সুন্নাত বা নফল হলে তৃতীয় এবং চতুর্থ রাকা'আতে সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা মিলিয়ে পড়ব।

জামা'আতে সালাত

আমরা বাড়িতে বা অন্য কোনো স্থানে সালাত পড়লেও তা আদায় হয়ে যাবে। তবে সালাত আদায়ের উত্তম স্থান হল মসজিদ। মসজিদে জামা'আতে সালাত আদায় করলে সাতাশগুণ বেশি সাওয়াব পাওয়া যায়। মসজিদ আল্লাহর ঘর। আমাদের বাড়িতে কোনো মেহমান এলে যেমন আমরা খুশি হই, ঠিক তেমনি বান্দা মসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করলে আল্লাহ তাআলা খুশি হন। জামা'আতে সালাত আদায় করা সম্পর্কে কুরআন পাকে বলা হয়েছে–

وَارْكَعُوْا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ۝

অর্থ : "তোমরা রুকূকারীদের সাথে রুকূ কর।" (বাকারাহ : ৪৩)

অর্থাৎ জামা'আতে সালাত আদায় কর। এমনকি যুদ্ধের ময়দানে দুশমনের সাথে যখন রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ চলতে থাকে তখনও জামা'আতে সালাত কায়েমের তাকিদ করা হয়েছে।

হাদীস শরীফে বলা হয়েছে, "যে ব্যক্তি চল্লিশদিন পর্যন্ত নিয়মিত জামাআতের সাথে সালাত আদায় করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে অব্যাহতি দিবেন।"

নবীজী বলেন, "যারা অন্ধকার রাতে কষ্ট করে সালাত আদায়ের জন্য মসজিদে যায় তাদেরকে সুসংবাদ জানিয়ে দাও যে, কিয়ামতের দিন তারা পরিপূর্ণ আলো পাবে।" (তিরমিযী)

যারা ইচ্ছা করে জামা'আতে শামিল হয় না তাদের সম্পর্কে প্রিয় নবী (স) বলেন, "আমার মন বলছে যে, কোনো মুয়ায্যিনকে হুকুম দিই যেন জামা'আতের ইকামত দেয় এবং আমি কাউকে হুকুম দিই যে, সে আমার স্থানে ইমামতী করুক। আর যারা আযান শুনেও জামা'আতে আসেনি আমি আগুনের কুণ্ডলী হাতে তাদের ঘরে আগুন লাগিয়ে দিই"। জামা'আত সম্পর্কে নবীজী এত কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন।

জামা'আতে সালাত আদায় করলে কেবল সাওয়াব পাওয়া যায় তাই নয়, সামাজিক শিক্ষাও পাওয়া যায়। যথাসময় সালাত আদায়ের দ্বারা আমরা যখনকার কাজ তখনই করতে হয়, এ শিক্ষা পাই। জামাআতে কাঁধে

কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াতে হয়, এতে আমরা একতার শিক্ষা পাই। সালাতের জন্য পাকপবিত্র হয়ে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে ধারাবাহিকভাবে সালাতের আহকাম আরকান পালন করতে হয়। এতে আমাদের মাঝে শৃঙ্খলাবোধ জাগ্রত হয়। জামাআতে একজন ইমাম থাকেন। ইমাম মানে নেতা। সালাতের প্রতিটি কাজে ইমামকে অনুসরণ করতে হয়। এতে আমরা নেতার প্রতি আনুগত্যের শিক্ষালাভ করতে পারি।

আমরা জামা'আতে সালাত আদায়ের গুরুত্ব জানলাম এবং নিয়মিত জামা'আতে সালাত আদায় করব।

সালাতের ফরয

সালাত সহীহ বা সঠিক হওয়ার জন্য এমন কতগুলো প্রয়োজনীয় জিনিস আছে যার একটি ছুটে গেলে সালাত হবে না। এগুলো মোট চৌদ্দটি। এগুলোকে সালাতের ফরয বলা হয়। এর মধ্যে সালাতের পূর্বে প্রস্তুতিমূলক সাতটি ফরয রয়েছে। এগুলোকে সালাতের **আহকাম বা শর্ত** বলা হয়। যথা–

১. শরীর পাক হওয়া।
২. পরিধানের কাপড় পাক হওয়া।
৩. সালাতের স্থান অর্থাৎ যে জায়গায় দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা হবে তা পাক হওয়া।
৪. পুরুষের নাভি থেকে হাঁটুর নিচ পর্যন্ত এবং স্ত্রীলোকের মুখমণ্ডল, হাতের কব্জি ও পায়ের পাতা ছাড়া সমস্ত শরীর ঢাকা।
৫. কিবলামুখী হওয়া অর্থাৎ কিবলার দিকে মুখ করে সালাত আদায় করা।
৬. সালাতের ওয়াক্ত হওয়া।
৭. নিয়্যাত করা অর্থাৎ যে ওয়াক্তের সালাত পড়তে হবে মনে মনে সেই ওয়াক্তের নিয়্যাত করা।

আর সালাতের ভিতরে সাতটি ফরয রয়েছে। এগুলোকে সালাতের **আরকান** বলা হয়। যথা–

১. তাকবীরে তাহরীমা-এর নিয়্যাত করে 'আল্লাহু আকবার' বলা।
২. দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা। দাঁড়াতে অক্ষম হলে বসে এবং বসতে সক্ষম না হলে শয়নাবস্থায় ইশারায় আদায় করতে হবে।
৩. কিরাআত পড়া।
৪. রুকূ করা।
৫. সিজদাহ করা।
৬. শেষ বৈঠকে বসা– যে বৈঠকের মধ্যে তাশাহ্হুদ, দরূদ ও দুআ মাসূরা পড়ে সালাম ফিরিয়ে সালাত শেষ করা হয় তাকেই বলা হয় শেষ বৈঠক।
৭. কোনো কাজের (সালামের) মাধ্যমে সালাত থেকে বের হওয়া।

সালাতের ওয়াজিব

সালাতের ওয়াজিব বলতে এমন সব জরুরি বিষয় বুঝায় যার মধ্যে ভুলবশত কোনো একটি ছুটে গেলে সিজদায়ে সাহু দ্বারা সালাত শুদ্ধ করতে হয়।

সালাতের ওয়াজিব চৌদ্দটি

১. প্রত্যেক রাকা'আতে সূরা ফাতিহা পড়া।
২. সূরা ফাতিহার সাথে কোনো একটি সূরা বা সূরার অংশবিশেষ পাঠ করা।
৩. রুকূ' সিজদাহ ও কিরাআতের আয়াতগুলোর ধারাবাহিকতা ঠিক রাখা।
৪. দুই সিজদার মাঝখানে সোজা হয়ে বসা।
৫. সালাতের রুকনগুলো সঠিকভাবে আদায় করা।
৬. রুকূ করার পর সোজা হয়ে দাঁড়ানো।
৭. প্রথম বৈঠক অর্থাৎ তিন বা চার রাকা'আত বিশিষ্ট সালাতে দুই রাকা'আত পড়ার পর তাশাহ্হুদ পড়ার জন্য বসা।
৮. তাশাহ্হুদ পাঠ করা।
৯. ইমামের জন্য উচ্চস্বরে কিরা'আত পড়ার স্থলে উচ্চস্বরে এবং চুপে চুপে পড়ার স্থলে চুপে চুপে কিরা'আত পড়া।
১০. বিতর সালাতে দুআ কুনুত পাঠ করা।
১১. সালাতের মধ্যে সিজদার আয়াত পড়লে তিলাওয়াতে সিজদাহ করা।
১২. সিজদার মধ্যে উভয় হাত ও হাঁটু মাটিতে রাখা।
১৩. দুই ঈদে অতিরিক্ত ছয় তাকবীর বলা।
১৪. আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহ বলে সালাত শেষ করা।

সালাতের সুন্নাত

নবী কারীম (স) সালাতের মধ্যে ফরয ওয়াজিব ছাড়াও কিছু আমল করেছেন কিন্তু এগুলো আদায়ের ব্যাপারে ফরয ওয়াজিবের ন্যায় তাকীদ করেননি। এগুলোকে বলা হয় সুন্নাত। যদিও এগুলো ছুটে গেলে সালাত নষ্ট হয় না কিংবা সাহু সিজদাহ দিতে হয় না, তথাপি এগুলো মেনে চলা উচিত। কারণ নবী কারীম (স) এভাবে সালাত আদায় করেছেন এবং অন্যকেও আদায় করতে বলেছেন।

সালাতের সুন্নাত একুশটি

১. তাকবীর তাহরীমা বলার সময় পুরুষের কানের লতি ও স্ত্রীলোকের কাঁধ পর্যন্ত দুই হাত উঠানো।
২. তাকবীর বলার সময় দুই হাতের আঙুলগুলো খুলে রাখা এবং কিবলামুখী করে রাখা।
৩. নিয়্যাত করার পর ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা। পুরুষের জন্য নাভির উপর এবং স্ত্রীলোকের বুকের উপর হাত রাখা।
৪. তাকবীর তাহরীমা বলার সময় মাথা অবনত না করা।
৫. ইমামের জোরে তাকবীর বলা।
৬. সানা পড়া।
৭. আউযু বিল্লাহ পড়া।
৮. প্রত্যেক রাকা'আতে সূরা ফাতিহার পরে বিসমিল্লাহ পড়া।
৯. ফরয সালাতের তৃতীয়, চতুর্থ রাকা'আতে শুধুমাত্র সূরা ফাতিহা পড়া।
১০. ফাতিহার পর আমীন বলা।
১১. সানা, আউযুবিল্লাহ, আমীন আস্তে বলা।
১২. কিরাআতে সুন্নাত তরিকা অনুসরণ করা।
১৩. রুকূ এবং সিজদায় কমপক্ষে একবার তাসবীহ পড়া।
১৪. রুকুতে মাথা ও কোমর সোজা রাখা এবং দুই হাতের আঙুল দিয়ে উভয় হাঁটু ধরা।
১৫. রুকূ থেকে উঠে দাঁড়ানো অবস্থায় ইমামের 'সামি আল্লাহু লিমান হামিদাহ' ও মুক্তাদির 'রাব্বানা লাকাল হামদ' বলা।
১৬. সিজদায় যাওয়ার সময় প্রথমে হাঁটু, তারপর দুই হাত, তারপর নাক এবং সর্বশেষ কপাল মাটিতে রাখা।

১৭. বসার সময় বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসা।
১৮. তাশাহ্হুদে "লা-ইলাহা"-এর 'লা' উচ্চারণের সময় শাহাদাত আঙুল উঠানো।
১৯. শেষ বৈঠকে তাশাহ্হুদের পর দরূদ পড়া।
২০. দরূদের পর দুআ মাসূরা বা এই জাতীয় কোনো দুআ পড়া।
২১. প্রথমে ডানে এবং পরে বামে সালাম ফিরানো।

সালাতের মুস্তাহাব

সালাতে এমন কিছু কাজ আছে যা মেনে চললে সাওয়াব পাওয়া যায়, কিন্তু ছেড়ে দিলে গুনাহ হয় না। এগুলোকে বলা হয় মুস্তাহাব। সালাতের কতিপয় মুস্তাহাব নিচে দেওয়া হল–

১. সালাতে দাঁড়ানো অবস্থায় সিজদার স্থানে দৃষ্টি রাখা।
২. রুকূর সময় পায়ের ওপর, সিজদার সময় নাকের ওপর এবং বসা অবস্থায় কোলের ওপর দৃষ্টি রাখা।
৩. হাঁচি এলে, হাই উঠলে, কাশি এলে যথাসম্ভব চেপে রাখার চেষ্টা করা।
৪. ধীরস্থিরভাবে কুরআন পাঠ করা।
৫. সিজদার সময় উভয় হাতের মধ্যস্থানে মাথা রাখা।
৬. মাগরিবের সালাতে ছোট সূরা পাঠ করা।
৭. একা একা সালাত পড়লে রুকূ, সিজদায় তাসবীহ তিনবারের বেশি পাঁচ, সাত কিংবা তার বেশিবার পড়া।

আমরা সালাতের ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত ও মুস্তাহাবগুলো বলতে পারব এবং গুরুত্বের সাথে পালন করব।

সালাত ভঙ্গ হওয়ার কারণ

সালাতের শুরুতে আমরা নিয়্যাত করে "আল্লাহু আকবার" বলে হাত বাঁধি, একে বলা হয় তাকবীরে তাহরীমা। এই তাকবীর বলার পর অন্য কোনো কাজ করা বা কথা বলা হারাম হয়ে যায়। যদি কেউ এমন কাজ করে ফেলে তবে সালাত বাতিল হবে। এমন কাজ করা গুনাহের কাজ। কী কী কাজ করলে সালাত ভেঙ্গে যায় তা আমাদের জেনে রাখা প্রয়োজন। সালাত ভঙ্গ হয়ে যাওয়ার কারণগুলো নিচে দেওয়া হল—

১. সালাতের মধ্যে কাউকে সালাম দিলে, সালামের উত্তর দিলে।
২. সালাতের মধ্যে কথা বললে।
৩. কিছু খেলে।
৪. কিছু পান করলে।
৫. শব্দ করে হাসলে।
৬. বিপদ বা কষ্টের জন্য উচ্চস্বরে কাঁদলে।
৭. ব্যথা বা রোগের কারণে 'উহ্ আহ্'এরূপ শব্দ করলে।
৮. কুরআন মাজীদ দেখে পড়লে।
৯. কিবলার দিক থেকে মুখ ঘুরালে।
১০. দুই হাত দিয়ে কোনো কাজ করলে।
১১. মুক্তাদী ইমাম অপেক্ষা সামনে দাঁড়ালে।
১২. নাপাক স্থানে সিজদাহ করলে।
১৩. দুনিয়ার কোনোকিছু প্রার্থনা করলে।
১৪. বিনা কারণে বারবার কাশি দিলে।
১৫. সালাতের কোনো ফরয বাদ গেলে।
১৬. কোনো সুসংবাদে 'আলহামদুলিল্লাহ' বললে।
১৭. কোনো দুঃসংবাদে 'ইন্নালিল্লাহ' বললে।
১৮. হাঁচি দিয়ে 'আলহামদুলিল্লাহ' বললে।

১৯. হাঁচির উত্তরে 'ইয়ারহামুকুমুল্লাহ' বললে।
২০. নিজের ইমাম ছাড়া অন্য কারো ভুল ধরলে।
২১. আমলে কাসীর (এমন কাজ করা যা দেখলে লোক মনে করবে যে, সে নামায পড়ছে না) করলে।

সালাত মাকরূহ হওয়ার কারণ

এমন কিছু কাজ আছে যাতে সালাত নষ্ট না হলেও সাওয়াব কম হয়, সেগুলোকে মাকরূহ বলে। এসব কাজ থেকে বিরত থাকা উচিত। নিচে এমন কতকগুলো কাজের কথা উল্লেখ করা হল

১. সালাতে বিনা কারণে আঙুল মটকানো।
২. আলসেমী করে খালি মাথায় সালাত আদায় করা।
৩. কাপড় ধূলাবালি থেকে বাঁচানোর জন্য গুটিয়ে নেওয়া।
৪. পরনের কাপড়, বোতাম, দাড়ি ইত্যাদি অহেতুক নাড়াচাড়া করা।
৫. ময়লা ও অশালীন পোশাক পরে সালাত আদায় করা।
৬. পেশাব-পায়খানা চেপে রেখে সালাত আদায় করা।
৭. এদিক-ওদিক তাকানো।
৮. সিজদায় দুই হাত কনুই পর্যন্ত বিছিয়ে দেওয়া।
৯. ইমামের মেহরাবের ভিতরে দাঁড়ানো।
১০. প্রাণীর ছবিযুক্ত কাপড় পরা।
১১. আগের কাতারে জায়গা থাকলেও একাকী পিছনে দাঁড়ানো।
১২. ইশারায় সালাম করা।
১৩. শুধু কপাল অথবা শুধু নাক মাটিতে ঠেকিয়ে সিজদাহ করা।
১৪. বিনা কারণে শুধু ইমামের উঁচুস্থানে দাঁড়ান।
১৫. বিনা কারণে চারজানু হয়ে বসা।
১৬. চোখ বন্ধ করে সালাত আদায় করা।
১৭. কিরাআত পুরা না করেই রুকূর জন্য ঝুঁকে পড়া।
১৮. সালাতের কোনো সুন্নাত বাদ দেওয়া।
১৯. সিজদার সময় পা মাটি থেকে উঠানো।
২০. সালাতে আয়াত, তাসবীহ আঙুল দিয়ে গণনা করা।
২১. কিরাআতে অসুবিধা হয় মুখে এমন কোনো জিনিস রাখা।

আমরা সালাত ভঙ্গের ও মাকরূহ হওয়ার কারণগুলো বলতে পারব। এগুলো থেকে সতর্ক থাকব।

সিজদায়ে সাহু

সাহু মানে ভুল। ভুলবশত সালাতে ওয়াজিব তরক হলে তা সংশোধনের জন্য সালাতের শেষ বৈঠকে দুইটি সিজদাহ করা ওয়াজিব। এরই নাম সিজদায়ে সাহু বা ভুল-সংশোধনের সিজদাহ।

সিজদায়ে সাহু আদায় করার নিয়ম

সালাতে শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পড়ার পর ডানদিকে সালাম ফিরাব। তারপর 'আল্লাহু আকবার' বলে সালাতের সিজদার ন্যায় দুই সিজদাহ করে তাশহহুদ, দরূদ ও দুআ মাসূরা পড়ব। তারপর দুইদিকে সালাম ফিরিয়ে সালাত শেষ করব।

যে কারণে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব

১. ভুলে সালাতের কোনো ওয়াজিব ছুটে গেলে।
২. সালাতের কাজগুলো পরপর আদায় করতে বিলম্ব করলে। যেমন – ফাতিহা পড়ার পর চুপ করে থাকা। কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর কোনো সূরা পড়া।
৩. কোনো ফরয আদায় করতে বিলম্ব হলে ।
৪. সালাত আদায়ে ধারাবাহিকতার খেলাফ হলে। যেমন – রুকূর আগেই সিজদাহ করলে।
৫. কোনো ফরয একবারের স্থলে একাধিকবার করলে।
৬. কোনো ওয়াজিবের রূপ পরিবর্তন করলে। যেমন– সরবে কিরাআত পড়ার স্থলে নীরবে এবং নীরবে পড়ার স্থলে সরবে পড়া।

সিজদাহ তিলাওয়াত

পবিত্র কুরআনে এমন কতগুলো আয়াত আছে যা পড়লে বা শুনলে সিজদাহ করা জরুরি হয়ে পড়ে। পুরো আয়াত বা আয়াতের অংশবিশেষ পাঠে, সিজদাহর শব্দটি পড়লে বা শুনলেই সিজদাহ দিতে হবে। সিজদাহ আদায় না করলে গুনাহ হয়। মহানবী (স) বলেন, "যখন কেউ সিজদাহর আয়াত পড়ে সিজদাহ করে তখন শয়তান একপাশে বসে বিলাপ করতে থাকে এবং বলে: হায় আফসোস! আদম-সন্তানদের সিজদাহর হুকুম দেওয়া হল, তারা সিজদাহ করল এবং জান্নাতের হকদার হল। আর আমাকে সিজদাহর হুকুম দেওয়া হলে আমি অস্বীকার করে জাহান্নামী হলাম।" (মুসলিম)

সিজদাহ তিলাওয়াতের নিয়ম

কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে সিজদায়ে তিলাওয়াতের নিয়্যাত করে "আল্লাহু আকবার" বলে সিজদাহ করতে হয়। সিজদাহ করার পর "আল্লাহু আকবার" বলে উঠে দাঁড়াতে হবে। তাশাহহুদ পড়া ও সালাম করার প্রয়োজন নেই। সিজদায়ে তিলাওয়াতে একটি সিজদাহ করলেই চলবে।

সিজদায়ে তিলাওয়াতের চারটি শর্ত

১. তাহারাত অর্থাৎ পাকপবিত্র হওয়া।
২. সতর ঢাকা।
৩. কিবলার দিকে মুখ করা।
৪. সিজদায়ে তিলাওয়াতের নিয়্যাত করা।

সিজদায়ে তিলাওয়াতের স্থান

১. সূরা আল্-আরাফ ২০৬ আয়াত।
২. সূরা রা'দ ১৫ আয়াত।
৩. সূরা আন্-নাহল ৪৯–৫০ আয়াত।
৪. সূরা বনী ইসরাঈল ১০৯ আয়াত।
৫. সূরা মারইয়াম ৫৮ আয়াত।
৬. সূরা আল্-হাজ্জ ১৮ আয়াত।
৭. সূরা আল্-ফুরকান ৬০ আয়াত।
৮. সূরা আন্-নামল ২৫–২৬ আয়াত।
৯. সূরা আলিফ-লাম-মীম-সিজদাহ ১৫ আয়াত।
১০. সূরা সাদ ২৪–২৫।
১১. সূরা হা-মীম-সিজদাহ ৩৮ আয়াত।
১২. সূরা আন্-নাজাম ৬২ আয়াত।
১৩. সূরা আল্-ইনশিকাক ২০–২১ আয়াত।
১৪. সূরা আল্-আলাক ১৯ আয়াত।

এ পাঠ থেকে আমরা জানলাম–

১. সালাতের অর্থ, গুরুত্ব, তাৎপর্য ও ফযীলাত।	৫. জামাআতে সালাত আদায়ের গুরুত্ব।
২. সঠিক সময়ে সালাত আদায় করা।	৬. সিজদাহ সাহু কেন দিতে হয়।
৩. সালাতের মুস্তাহাব সময়।	৭. সালাত ভঙ্গের কারণ।
৪. সালাতের মাকরূহ ও নিষিদ্ধ সময়।	৮. সিজদায়ে তিলাওয়াতের গুরুত্ব ও এর নিয়মাবলি।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। সালাতের প্রত্যেক রাকা'আতে পড়তে হয় —

ক. সূরা নাস খ. সূরা ফীল

গ. সূরা ফাতিহা ঘ. সূরা ইখলাস

২। সালাতে সিজদা করা —

ক. ফরয খ. সুন্নাত

গ. ওয়াজিব ঘ. নফল

৩। জামা'আতে সালাত আদায় করলে কতগুণ বেশি সাওয়াব পাওয়া যায় —

ক. পঁচিশ গুণ খ. সাতাইশ গুণ

গ. ছাব্বিশ গুণ ঘ. আঠাইশ গুণ

৪। তায়াম্মুম প্রযোজ্য হয়-

i. পানি পাওয়া না গেলে

ii. অসুস্থতার কারণে পানি ব্যবহারে অক্ষম হলে

iii. পবিত্র মাটি পাওয়া গেলে

নীচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

৫। হাদীস অনুযায়ী কেউ ভালো কাজের পরামর্শ দিলে পরামর্শদাতা পরামর্শ পালনকারীর –

ক. অপেক্ষা কম সাওয়াব পাবে খ. সমান সাওয়াব পাবে

গ. অপেক্ষা কখনও কখনও সমান সাওয়াব পাবে ঘ. অপেক্ষা বেশি সাওয়াব পাবে

নিচের তথ্যের আলোকে ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র মোঃ আলমগীর হোসেন তাড়াতাড়ি ওযূ করে মসজিদে জামা'আতে দাঁড়ানোর পূর্বে তার বন্ধু দেখল আলমগীরের গোড়ালির নিচের পেছনের অংশ শুকনা।

৬। তুমি কি মনে কর –

ক. আলমগীর হোসেনের ওযূ সঠিক হয়েছে খ. আলমগীর হোসেনের ওযূ হয়নি

গ. আলমগীর হোসেনের ওযূ ত্রুটিপূর্ণ হয়েছে ঘ. জামা'আতে অংশগ্রহণের জন্য এটি ত্রুটিপূর্ণ নয়

৭। আলমগীর হোসেনের বন্ধুর উচিত ছিল —

ক. নিয়্যাত করার আগে ভুল এড়িয়ে যাওয়া
খ. নামায শেষে ভুল ধরিয়ে দেওয়া
গ. নিয়্যাতের আগে পুনরায় ওযু করতে বলা
ঘ. নামায শেষে ওযূর নিয়ম শিখতে বলা

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। হাবীবুর রহমানের দাদা শেষ বয়সে নিয়মিতভাবে নামায পড়া শুরু করেছেন। একদিন মসজিদে ওযূ ও গোসলের নিয়ম সম্পর্কে আলোচনা শুনার পর বুঝতে পারলেন, তার জীবনের ফরয গোসল একটিও আদায় হয়নি। তাই তিনি ভাবতে থাকেন যে, তার কোনো নামাযই তো আল্লাহর দরবারে কবুল হয়নি। এ কারণে তিনি আখেরাতের ভয়ে কাঁদতে থাকেন।

ক. ওযূর ফরয কয়টি ?
খ. গোসলের নিয়ম বর্ণনা কর।
গ. হাবীবুর রহমানের দাদা কীভাবে ফরয গোসল করবে ? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. 'নামায আদায়ের লক্ষ্যে গোসলের পরপরই ওযূ করার প্রয়োজন নেই।' উক্তিটির তাৎপর্য আলোচনা কর।

২। তাহমিনা স্কুল থেকে ফিরে দেখে তার মা প্রায়ই বিকালবেলা সালাত আদায় করে। তা দেখে তাহমিনা তার মাকে জিজ্ঞাসা করে, "মা, তুমি এখন কোন্ সালাত আদায় করছ?" মা বলল, "যুহ্‌রের সালাত।" তাহমিনা বলল, "এখন তো যুহ্‌রের ওয়াক্তই শেষ।" মা বলল, দেখতেই তো পারছ, কাজকর্মে দেরি হয়ে যায়। আল্লাহ নিশ্চয় মাফ করবেন। তাহমিনা বলল, "মা তোমার এ ধারণা ঠিক নয়। কারণ আল্লাহ বলেছেন, 'নিশ্চয়ই সঠিক সময়ে সালাত কায়েম করা মুমিনের ফরয'। পুরুষরা জামা'আতে সালাত আদায় করলে পুরুষ্কার পায়।

ক. সালাতের ওয়াক্ত হওয়া কী ?
খ. যুহ্‌রের সালাতের সময়সূচি বর্ণনা কর।
গ. তাহমিনার মাকে সঠিক সময়ে সালাত আদায়ে সহায়তা করতে পারে এমন একটি সময়সূচির চার্ট তৈরি কর।
ঘ. "নিশ্চয়ই সঠিক সময়ে সালাত কায়েম করা মু'মিনের ফরয"–আয়াতটি বিশ্লেষণ কর।

৩। ফয়সাল নিয়মিত সালাত আদায় করে কিন্তু সব রোযা রাখে না। ফাহিম রোযা রাখে এবং সালাত আদায় করে। অপর বন্ধু সাজজাদ এ প্রসঙ্গে ফয়সাল ও ফাহিমকে বলল–শুধু কি সালাত, রোযা ও হাজ্জই আমাদের ইবাদাতের বিষয়? আমি ইমাম সাহেবের খুতবায় শুনেছি আমাদের জীবনের চব্বিশ ঘণ্টাই ইবাদাত হতে হবে। তবে সর্বোত্তম ইবাদাত আদায়ের শর্ত হচ্ছে পবিত্রতা। আল্লাহর রাসূল বলেন, "পাক-পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক।"

ক. ইবাদাত শব্দের অর্থ কী ?
খ. সাজ্জাদ ইবাদাত বলতে কী বুঝিয়েছে ? ব্যাখ্যা কর।
গ. ফয়সাল কীভাবে তার জীবনকে ইবাদাতের মধ্যে কাটাতে পারে ? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. "পাক-পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক।"–হাদীসটির তাৎপর্য লিখ।

তৃতীয় অধ্যায়

কুরআন মাজীদ ও হাদীস শরীফ শিক্ষা

কুরআন মাজীদ

পরিচয়

কুরআন মাজীদ মহান আল্লাহর বাণী। আল-কুরআন কোনো মানুষের কথা নয়। আল্লাহ তাআলা মানুষকে সঠিক পথ দেখানোর জন্য কুরআন মাজীদ নাযিল করেছেন। মানুষ কোন পথে চললে দুনিয়াতে শান্তি পাবে, আখিরাতে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি থেকে মুক্তি পাবে এবং জান্নাতের পরম সুখ-শান্তি লাভ করবে, তা আল্লাহ তাআলা তাঁর বাণীর মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন। তাঁর এসব বাণীর সমষ্টিই কুরআন মাজীদ।

কুরআন মাজীদ হযরত মুহাম্মাদ (স)–এর ওপর অবতীর্ণ

নবুওয়্যাত লাভের পূর্বে হযরত মুহাম্মাদ (স) হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন থাকতেন। তাঁর বয়স যখন চল্লিশ বছর তখন ফেরেশতা হযরত জিবরাঈল (আ) সেখানে তাঁর নিকট আল্লাহ তাআলার বাণী নিয়ে উপস্থিত হন। এসময় সূরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত তাঁর ওপর নাযিল করেন। এরপর থেকে প্রয়োজন আনুসারে জিবরাঈল (আ) কুরআন মাজীদের অংশবিশেষ নিয়ে নবী কারীম (স)-এর নিকট আসতেন। এভাবে মহানবী (স)–এর দীর্ঘ তেইশ বছর নবুওয়্যাতকালে পবিত্র কুরআনের অবতরণ সম্পন্ন হয়।

কুরআন মাজীদ সর্বশেষ আসমানী কিতাব

আল্লাহ তাআলা মানুষকে সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য যুগে যুগে নবী ও রাসূলগণের নিকট তাঁর কিতাব প্রেরণ করেন। আসমানী কিতাবের সর্বমোট সংখ্যা ১০৪ খানা। এ সকল কিতাবের মধ্যে বড় বড় কিতাব হল চারটি—তাওরাত, যাবুর, ইনজীল এবং আল-কুরআন।

কুরআন মাজীদ সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (স) সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। তাঁর পর কিয়ামত পর্যন্ত আর কোনো নবী আসবেন না। তাই তাঁর ওপর অবতীর্ণ কিতাবই সর্বশেষ আসমানী কিতাব। এতে পূর্ববর্তী সকল কিতাবের মূল ও সারকথা উল্লেখ করা হয়েছে। পূর্ববতী অনেক নবী-রাসূল এবং তাঁদের উম্মাতদের বর্ণনাও আছে। যে সকল জাতি নবীগণের বিরোধিতা এবং আল্লাহর হুকুম অমান্য করেছে তাদের শাস্তির কথাও কুরআন মাজীদে বর্ণিত আছে। আল্লাহ তাআলা এ পৃথিবীতে যত নবী পাঠিয়েছেন, তাঁদের সকলকে এমন কিছু মু'জিযা (অলৌকিক বস্তু) দিয়েছিলেন যা দেখে লোকেরা তাঁদের প্রতি ঈমান আনে।

আমাদের নবীর সবচেয়ে বড় মু'জিযা কুরআন মাজীদ। আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে তাঁর ইন্তিকাল হয়েছে, কিন্তু কুরআন মাজীদ আজও ঠিক তেমনি আছে যেমনটি তাঁর সময় ছিল এবং কিয়ামত পর্যন্ত অনুরূপ থাকবে।

কুরআন মাজীদ শিক্ষা

কুরআন মাজীদ সকলপ্রকার জ্ঞানবিজ্ঞানের ভান্ডার। এটি মানবজাতির দিশারী। সত্য ও মিথ্যা, ন্যায় ও অন্যায়, হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী। দুনিয়ায় মানুষ কীভাবে জীবনযাপন করবে তার নির্দেশনা কুরআন মাজীদে আছে। কাজেই কুরআন মাজীদ শিক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন।

কুরআন তিলাওয়াতের গুরুত্ব ও ফযীলাত

তিলাওয়াত শব্দের অর্থ পাঠ করা। কুরআন মাজীদ আমাদের পবিত্র গ্রন্থ, এর তিলাওয়াত একটি পবিত্র কাজ। কুরআন তিলাওয়াত করলে প্রতি হরফে (অক্ষর) দশটি করে নেকী পাওয়া যায়। যে ঘরে কুরআন তিলাওয়াত করা হয় সে ঘরে আল্লাহর রহমত নাযিল হয়। তিলাওয়াতকারীর প্রতি আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট থাকেন।

কুরআন মাজীদের আয়াত বুঝে বুঝে তিলাওয়াত করা উত্তম। বুঝে পাঠ করলে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ জানা যাবে এবং তিলাওয়াতের হক আদায় হবে। আমাদের প্রিয় নবী (স) কুরআন মাজীদের তিলাওয়াতকে অতি উত্তম ইবাদাত বলে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে আমাদের মাঝে এজন্যই প্রেরণ করেছেন যাতে তিনি আমাদেরকে কুরআন তিলাওয়াত করে শোনান এবং কুরআনের শিক্ষা দেন। রাসূলুল্লাহ (স) ও তাঁর সাহাবীগণ কুরআন মাজীদ অধিক পরিমাণে তিলাওয়াত করতেন এবং সে অনুযায়ী আমল করতেন।

এ পাঠ থেকে আমরা জানতে পারলাম, কুরআন মাজীদের পরিচয়, কুরআন মাজীদ তিলাওয়াতের গুরুত্ব ও ফযীলাত সম্বন্ধে। কাজেই আমরা সব সময় কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করব এবং তার অর্থ বুঝতে চেষ্টা করব।

তাজবীদ

কুরআন মাজীদের প্রতিটি হরফ মাখরাজ এবং সিফাত অনুসারে পড়ার নাম তাজবীদ। মাখরাজ অর্থ বের হওয়ার স্থান। আর সিফাত অর্থ আরবি উচ্চারণের বিশেষ অবস্থা। কোনো কোনো আরবি বর্ণকে উচ্চারণ করার সময় মোটা করে উচ্চারণ করতে হয়, যেমন ط (ত্বয়া)। আবার কোনো কোনো বর্ণকে চিকন বা সরু করে উচ্চারণ করতে হয়, যেমন (তা) ت। ط এবং ت -এর উচ্চারণ স্থান এক ও অভিন্ন। কিন্তু উচ্চারণে ط -কে মোটা করে উচ্চারণ করতে হয়। বর্ণের উচ্চারণের এ বিশেষ অবস্থার নাম সিফাত। তাজবীদ অনুসারে কুরআন তিলাওয়াত করা ওয়াজিব। তাজবীদ অনুসারে কুরআন না পড়লে পাঠকারী গুনাহগার হবে এবং সালাত শুদ্ধ হবে না। আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে বলেছেন–

وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ۝

অর্থ : "তোমরা কুরআন থেমে থেমে পড়ো।"

বিশুদ্ধভাবে থেমে পড়াকে তারতীল বলা হয়। শুদ্ধ করে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করার শিক্ষার্থী এবং শিক্ষাদানকারীর মর্যাদা অনেক বেশি। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন–

خَيْرُكُمْ مَّنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهٗ-

অর্থ : "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং অন্যকে শিক্ষা দেয়।"

ভোরবেলায় মনোযোগসহ কুরআনের একটি আয়াত পড়তে শেখা অনেক মূল্যবান সম্পদের চেয়েও উত্তম।

মাখরাজ

আরবি ভাষায় সর্বমোট ২৯টি হরফ বা বর্ণ আছে। এ হরফগুলো মুখের ১৭টি স্থান থেকে উচ্চারিত হয়। এ উচ্চারণ স্থানকে মাখরাজ বলা হয়। মাখরাজগুলো মুখের ৫টি স্থানে অবস্থিত।

১.	হলক (কণ্ঠনালি)	৪.	নাসিকামূল এবং
২.	জিহ্বা	৫.	জাওফ (মুখের খালি জায়গা)।
৩.	উভয় ঠোঁট		

মাখরাজের বিস্তারিত বিবরণ

১. প্রথম মাখরাজ মুখের খালিস্থান। এ স্থান থেকে তিনটি হরফ উচ্চারিত হয়।

(ক) জযমবিশিষ্ট و যথা- أُوْ

(খ) জযমবিশিষ্ট ى যথা- إِىْ

(গ) হরকত বিহীন আলিফ যখন এর ডান পাশের হরফে যবর থাকে। যথা- مَا

উল্লিখিত এ তিনটি হরফ উচ্চারণের সময় মুখ, হলক বা জিহ্বা কোনো স্থানে লাগে না। বরং মুখের মাঝখানে সৃষ্ট বাতাসের ওপর উচ্চারিত হয়। এগুলোকে হরফে মাদ বা মাদবিশিষ্ট অক্ষরও বলা হয়।

২. কণ্ঠের নিম্নাংশ থেকে উচ্চারিত হয় ء - ه হামযা ও হা। যথা- أَ أْ — إِهْ

৩. কণ্ঠের মধ্যবর্তী স্থান থেকে উচ্চারিত হয় ح – ع যথা- أَحْ — أَعْ

৪. কণ্ঠের উপরিভাগ থেকে উচ্চারিত হয় خ – غ যথা- أَخْ — أَغْ একত্রে এ ছয়টি হরফকে হরফে হালকী বা কণ্ঠবর্ণ বলা হয়।

৫. জিহ্বার গোড়া ও তার বরাবর ওপরের তালু থেকে উচ্চারিত হয় ق । যথা- أَقْ

৬. জিহ্বার গোড়ার কিঞ্চিৎ উপরিভাগ এবং তার বরাবর ওপরের তালু সংযোগে উচ্চারিত হয় ك । যথা- أَكْ

৭. জিহ্বার মধ্যভাগ তার বরাবর ওপরের তালু সংযোগে উচ্চারিত হয় ج.ش.ى । যথা- أَجْ – أَشْ – أَىْ

৮. জিহ্বার পাশ ও ওপরের মাড়ির দাঁতের সংযোগে উচ্চারিত হয় ض। যথা- أَضْ

৯. জিহ্বার অগ্রভাগের পাশ সম্মুখের দাঁতের গোড়ার দিকের তালুর সাথে লেগে উচ্চারিত হয় ل। যথা- أَلْ

১০. জিহ্বার অগ্রভাগ এবং সে সোজা ওপরের তালু থেকে উচ্চারিত হয় ن । যথা- أَنْ

১১. জিহ্বার অগ্রভাগের পিঠ তালুর সাথে লেগে উচ্চারিত হয় ر । যথা- أَرْ

১২. জিহ্বার অগ্রভাগ সম্মুখের ওপরের দুই দাঁতের গোড়ার সাথে লেগে উচ্চারিত হয় ط.د.ت

যথা- أَطْ – أَدْ – أَتْ

১৩. জিহ্বার অগ্রভাগে সামনের নিচের দুই দাঁতের মাথা এবং ওপরের দাঁতের কিঞ্চিৎ সহযোগিতায় উচ্চারিত হয়। ওপরের দুই দাঁতের অগ্রভাগে লেগে উচ্চারিত হয় ص . س . ز । যথা- أَصْ – أَسْ – أَزْ

১৪. জিহ্বার অগ্রভাগ সামনের ওপরের দুই দাঁতের অগ্রভাগে লেগে উচ্চারিত হয় ظ . ذ . ث ।
যথা- أَظْ – أَذْ – أَثْ

১৫. নিচের ঠোঁটের ভেজা অংশ সামনের ওপরের দুই দাঁতের সাথে লেগে উচ্চারিত হয় ف । যথা- أَفْ

১৬. নিচের ঠোঁট থেকে উচ্চারিত হয় م٠ب٠و। ঠোঁটের ভিজা অংশ থেকে উচ্চারিত হয় ب । ঠোঁটের শুষ্ক অংশ থেকে উচ্চারিত হয় م। উভয় ঠোঁটের ডান ও বাম পাশ গোল হয়ে অর্ধফোটা ফুলের ন্যায় মধ্যস্থলে গোলাকার ছিদ্র ধারণ করে উচ্চারিত হয় و। যথা- أَمْ – أَبْ – أَوْ

১৭. নাসিকামূল থেকে গুন্নাহ উচ্চারিত হয়। নূন জযম বিশিষ্ট হলে কখনও কখনও এ নূনকে নাসিকামূলে গোপন করার উদ্দেশ্যে গুন্নাহ করতে হয়। যেমন- مِنْ سِجِّيْلٍ।

আরবি হরফ নিজের মাখরাজ থেকে উচ্চারণ করা অত্যাবশ্যক। আরবি কোনো অক্ষরকে যদি নিজের মাখরাজ থেকে উচ্চারণ না করে অন্য মাখরাজ থেকে উচ্চারণ করা হয় তবে এতে শব্দের অর্থ ঠিক থাকে না। ফলে কখনও কখনও বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ উল্টে যায়। যেমন قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ –'বলো আল্লাহ এক'। এখানে قُلْ অর্থ বলো। এখন যদি قُلْ এর ق -কে তার নিজস্ব মাখরাজ থেকে উচ্চারণ না করে ك-এর মাখরাজ থেকে উচ্চারণ করা হয় তবে এর অর্থ হবে كُلْ "ভক্ষণ কর"। ফলে বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ বিগড়ে যাবে।

আমরা অতি যত্ন সহকারে আরবি হরফগুলোর মাখরাজ মশ্‌ক বা অনুশীলন করে ঠিক করে নেব।

নাযিরা তিলাওয়াত

কুরআন মাজীদ দেখে পড়াকে নাযিরা তিলাওয়াত বলা হয়। কুরআন মাজীদ দেখে পড়া উত্তম। যারা কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করবে কিয়ামতের দিন কুরআন মাজীদ তাঁদের জন্য সুপারিশ করবে। এ পাঠে আমরা শুদ্ধভাবে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াতে সক্ষম হব এবং নিয়মিত কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করব।

সূরা আল্-ফাতিহা (سُوْرَةُ الْفَاتِحَةِ)

সূরা আল্-ফাতিহা মক্কায় অবতীর্ণ হয়। আয়াত সংখ্যা সাতটি। সূরা আল-ফাতিহা কুরআন মাজীদের প্রথম ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সূরা। এ সূরা দ্বারাই কুরআন মাজীদ আরম্ভ হয়েছে এবং এ সূরা দিয়েই সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদাত সালাত আরম্ভ হয়। এ সূরা কুরআন মাজীদের ভূমিকাস্বরূপ। তাই এর নাম সূরা আল-ফাতিহা রাখা হয়েছে। ফাতিহা অর্থ ভূমিকা। অবতরণের দিক থেকেও পূর্ণাঙ্গ সূরারূপে এটি প্রথম নাযিল হয়। সূরা ফাতিহা সমগ্র কুরআনের সার-সংক্ষেপ। তাই একে উম্মুল কুরআন বা কুরআনের মূল বলে অভিহিত করা হয়েছে। এ সূরা উম্মুল কিতাব বা কিতাবের মূল।

শব্দার্থ

اَلْحَمْدُ – যাবতীয় প্রশংসা।
رَبٌّ – প্রতিপালক।
نَعْبُدُ – আমরা ইবাদাত করি, দাসত্ব করি।
اِيَّاكَ – শুধু তোমরাই।
نَسْتَعِيْنُ – আমরা সাহায্য চাই।
اِهْدِنَا – আমাদের পথ দেখাও।
صِرَاطٌ – পথ, রাস্তা।
مَغْضُوْبٌ – অভিশপ্ত।
ضَالِّيْنَ – পথভ্রষ্ট।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

১. যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য যিনি সমগ্র সৃষ্টিজগতের পালনকর্তা।

اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

২. যিনি পরম দয়ালু, অসীম দয়াময়।

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ○

৩. যিনি বিচার দিনের মালিক।

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ○

৪. আমরা শুধু তোমারই ইবাদাত করি এবং শুধু তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ○

৫. আমাদের সরল পথ দেখাও।

صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ○

৬. সে সমস্ত লোকের পথ যাদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ করেছ।

غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ○

৭. যারা অভিশপ্ত নয় এবং পথভ্রষ্টও নয়।

ব্যাখ্যা

সূরা ফাতিহায় সমগ্র কুরআনের সারমর্ম সংক্ষিপ্তভাবে বলে দেওয়া হয়েছে। প্রথম তিনটি আয়াতে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা এবং শেষ তিনটি আয়াতে মানুষের পক্ষ থেকে আল্লাহর কাছে সঠিক মুনাজাত ও দরখাস্তের বিষয়বস্তুর সংমিশ্রণ রয়েছে। প্রথমত আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করা হয়েছে। কারণ তিনি হলেন সৃষ্টিজগতের পালনকর্তা। তিনি পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু। বিচার দিবসের মালিক। কাজেই যাবতীয় প্রশংসা একমাত্র তাঁরই প্রাপ্য।

আমরা কেবল সেই মহান আল্লাহরই ইবাদাত করি এবং তাঁরই কাছে সাহায্য চাই। তাঁর কাছে আমাদের মুনাজাত: হে আল্লাহ তাআলা! তুমি আমাদের সরল সঠিক পথে অর্থাৎ ইসলামের পথে পরিচালিত কর। যে পথে তোমার প্রিয় বান্দারা অর্থাৎ নবী-রাসূলগণ ছিলেন এবং মুমিন বান্দাগণ রয়েছেন। ভ্রান্তপথ থেকে তুমি আমাদের রক্ষা কর, যে পথে অভিশপ্তরা রয়েছে। যেমন ইয়াহূদী, নাসারা ইত্যাদি জাতি। আমীন! কবুল কর, হে রাব্বুল আলামীন।

সূরা আন্ নাস (سُوْرَةُ النَّاسِ)

সূরা নাস মক্কায় অবতীর্ণ হয়। সূরা নাস কুরআন মাজীদের সর্বশেষ সূরা। সূরা ফাতিহায় আল্লাহ তাআলার নিকট বান্দা সহজ সরল পথের সন্ধান চেয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাঁদের এ পথের দিশারী হিসেবে কুরআন মাজীদ দান করেছেন। কুরআনের পথে চলার ক্ষেত্রে মানুষের কিছু বাধার সৃষ্টি হয়। এ বাধা-বিপত্তি সৃষ্টি করে জিন শয়তান এবং মানুষ শয়তান। এ সূরায় এ দুই প্রকার কুমন্ত্রণাদানকারী শয়তানের ধোঁকা থেকে রাব্বুল আলামীনের নিকট আশ্রয় চাওয়া হয়েছে।

শব্দার্থ

اَعُوْذُ — আমি আশ্রয় চাই।		اِلٰهٌ — মাবূদ।	
بِ — দ্বারা, সাথে।		اَلْوَسْوَاسُ — কুমন্ত্রণা।	
رَبٌّ — প্রতিপালক।		اَلْخَنَّاسُ — কুমন্ত্রণাদাতা।	
اَلنَّاسُ — মানুষ।		صُدُوْرٌ — অন্তরসমূহ।	
مَلِكٌ — অধিপতি।		اَلْجِنَّةُ — জিন।	

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ০

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ০

১. বলুন, আমি আশ্রয় চাই মানুষের প্রতিপালকের কাছে।

مَلِكِ النَّاسِ ০

২. মানুষের অধিপতির কাছে।

اِلٰهِ النَّاسِ ০

৩. মানুষের মাবূদের কাছে।

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ০

৪. আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট থেকে।

الَّذِیْ يُوَسْوِسُ فِیْ صُدُوْرِ النَّاسِ ০

৫. যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরসমূহে।

مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ০

৬. জিন এবং মানুষের মধ্য থেকে।

ব্যাখ্যা

সূরা নাসে সমস্ত বিপদাপদ থেকে মুক্তির জন্য পরম করুণাময় আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাওয়া হয়েছে। সমস্ত বিপদাপদ থেকে একমাত্র আল্লাহ তাআলাই রক্ষা করতে পারেন। কেননা তিনি মানুষের পালনকর্তা, অধিপতি এবং মাবুদ। এ সূরায় আল্লাহ তাআলার এ তিনটি গুণের কথা উল্লেখ করে তাঁর নিকট মানুষ শয়তান এবং জিন শয়তানের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে।

শয়তান মানুষের পরম শত্রু। সে মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দিয়ে মানুষকে প্রতারিত করে। আল্লাহ তাআলার সাহায্য ছাড়া শয়তানের কুচক্র থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব নয়। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে অভিশপ্ত শয়তান ও মানুষের ধোঁকা থেকে রক্ষা কর।

সূরা আল্-ফালাক (سُوْرَةُ الْفَلَقِ)

সূরা আল্-ফালাক মক্কায় অবতীর্ণ হয়। সূরা আল্-ফালাক এবং সূরা নাসের পরস্পর সম্পর্ক গভীর। সূরা ফালাকে পৃথিবীর বিভিন্ন বস্তুর অনিষ্ট থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাওয়া হয়েছে। দুনিয়ার সকল বস্তুই আল্লাহ তাআলার অধীন। তাঁর ইচ্ছা ছাড়া কেউ কারও অণু-পরিমাণ উপকার অথবা অপকার করতে পারে না এবং আল্লাহ সবকিছুর অপকার থেকে রক্ষা করতে পারেন। এ কারণে যাবতীয় বস্তুর ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য একমাত্র আল্লাহর নিকটই আশ্রয় কামনা করতে হবে।

শব্দার্থ

فَلَقٌ	প্রভাত।	وَقَبٌ	অন্ধকারে আচ্ছন্ন হল; অন্ধকার গভীর হল।
مِنْ	থেকে।	نَفّٰثٰتِ	ফুৎকারকারীগণ।
خَلَقَ	সৃষ্টি করেছেন।	عُقَدٌ	গ্রন্থিসমূহ, গিরাসমূহ।
غَاسِقٌ	অন্ধকারে আচ্ছন্নকারী রাত্রি।	حَاسِدٌ	হিংসুক।
إِذَا	যখন।	حَسَدَ	হিংসা করল।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ○

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ○

১. বলুন, আমি আশ্রয় চাচ্ছি ঊষার পালনকর্তার।

مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ○

২. তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, এর অনিষ্ট থেকে

وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ○

৩. অন্ধকার রাত্রির অনিষ্ট থেকে, যখন তা গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়।

وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ○

৪. এবং সে-সকল নারীর অনিষ্ট থেকে, যারা গ্রন্থিতে ফুৎকার দেয়।

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ○

৫. আর হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে।

ব্যাখ্যা

সূরা ফালাক-এর প্রথম আয়াতে প্রভাতের রবের নিকট আশ্রয় কামনা করা হয়েছে। প্রভাতে আল্লাহ যেভাবে রাতের অন্ধকার দূর করে ঊষার আলো উদ্ভাসিত করেন, সেভাবে তিনি আমাদের জীবনের যাবতীয় বিপদের অন্ধকার দূর করে মুক্তি ও শান্তি দান করেন এবং সকল বিপর্যয় থেকে আমাদের রক্ষা করেন। দ্বিতীয় আয়াতে স্রষ্টার নিকট সকল অনিষ্টসাধনকারী বস্তু থেকে আশ্রয় চাওয়া হয়েছে।

পরবর্তী তিনটি আয়াতে বিশেষ তিনটি বিপদের উল্লেখ রয়েছে। এসব বিপদ থেকে আমরা একমাত্র আল্লাহ তাআলার কাছেই আশ্রয় চাইতে পারি। তিনি অসীম ক্ষমতার অধিকারী। জীবনের যেকোনো বিপদ-আপদে তাঁকেই আমাদের স্মরণ করতে হবে। তিনি সকলপ্রকার অনিষ্ট থেকে আমাদের উদ্ধার করতে পারেন।

সূরা আল্-আসর (سُوْرَةُ الْعَصْرِ)

সূরা আল্-আসর মক্কায় অবতীর্ণ হয়। আয়াত সংখ্যা তিন। এ সূরা কুরআন মাজীদের একটি সংক্ষিপ্ত সূরা, কিন্তু এ সূরার অর্থ অতি ব্যাপক। ইমাম শাফিঈ (র) এ সূরা সম্পর্কে বলেছেন, "এ সূরাটি চিন্তা সহকারে পাঠ করলে মানুষের ইহকাল ও পরকাল সংশোধনের জন্য যথেষ্ট হবে।" মানুষের কল্যাণের পথ কোনটি এবং তাদের ধ্বংসের পথ কোনটি, এ সূরায় তা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে।

আমরা এ সূরাটি মুখস্থ করব এবং এর অর্থ শিখব।

শব্দার্থ

وَالْعَصْرِ — সময়ের শপথ।

اِنَّ — অবশ্যই।

فِىْ — মধ্যে।

خُسْرٌ — ক্ষতি।

اَلَّذِيْنَ — যারা।

اٰمَنُوْا — ঈমান এনেছে।

اَلصّٰلِحٰتُ — সৎ কর্মাবলি।

تَوَاصَوْا — পরস্পরকে উপদেশ দিয়েছে।

اَلصَّبْرُ — ধৈর্য।

اَلْاِنْسَانُ — মানুষ।

اِلَّا — তবে।

عَمِلُوْا — কাজ করেছে।

اَلْحَقُّ — সত্য।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

وَالْعَصْرِ ○

১. সময়ের শপথ।

اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ ○

২. মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত।

اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ ○

৩. কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে।

وَتَوَا صَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَا صَوْا بِا لصَّبْرِ ○

৪. আর পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়।

ব্যাখ্যা

সূরা আসরে আল্লাহ তাআলা যুগের কসম করে বলেছেন, মানুষ ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত। তবে যারা নিষ্ঠার সাথে চারটি কাজ করে কেবল তারাই ক্ষতি থেকে মুক্তি পাবে। এ চারটি কাজ হচ্ছে "ঈমান, সৎকর্ম, একে অপরকে সত্যের উপদেশ এবং ধৈর্যের উপদেশ দান"। সময় ও কাল মানবজীবনের অতি মূল্যবান বস্তু। সময়ের সঠিক ব্যবহার করলে ইহকাল ও পরকালে সফলতা লাভ করা যায়। এ মহামূল্যবান সময়ের কসম করে আল্লাহ তাআলা মানুষকে সতর্ক করেছেন।

চারটি সৎকাজের মধ্যে প্রথম দুইটি কাজ আত্মসংশোধনমূলক। এ দুইটির প্রথমটি হল ঈমান। আল্লাহকে এক, অদ্বিতীয় এবং হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে রাসূল বলে স্বীকার করার নাম ঈমান। ঈমানের পর নেক-কাজ মানুষকে ক্ষতি থেকে বাঁচাতে পারে। নেক আমল ব্যতীত শুধু ঈমান মানুষকে ধ্বংস থেকে বাঁচাতে পারে না।

পরবর্তী দুইটি সামাজিক কাজ। সমাজে কোনো অন্যায় হতে দেখলে সেখানে নীরব দর্শক হয়ে বসে থাকা যাবে না। অন্যায়কারীকে বুঝাতে হবে, ভালো কাজের পরামর্শ দিতে হবে। শুধু নিজে সৎকাজ করলে মুক্তি পাওয়া যাবে না। নিজের বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশী সকলকে ভালোমানুষ করার জন্য চেষ্টা করতে হবে। এ চেষ্টা করতে গিয়ে বাধার সম্মুখীন হলে থেমে যাওয়া ঠিক নয়, বরং ধৈর্যধারণ করতে হবে। একে অপরকে ধৈর্যধারণের উপদেশ দিতে হবে।

সূরা আল্-হুমাযাহ (سُوْرَةُ اَلْهُمَزَةِ)

সূরা হুমাযাহ মক্কায় অবতীর্ণ হয়। সূরা হুমাযাতে মানুষের কয়েকটি ঘৃণ্য স্বভাবের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। যে ব্যক্তির মধ্যে এ খারাপ অভ্যাসগুলো থাকে সে সমাজে ঘৃণিত। এ ধরনের ব্যক্তি পরকালে কঠিন শাস্তি পাবে।

শব্দার্থ

وَيْلٌ — দুর্ভোগ।
كُلٌّ — প্রত্যেক।
هُمَزَةٌ — নিন্দুক।
لُمَزَةٌ — সম্মুখে নিন্দাকারী।
جَمَعَ — সঞ্চিত করেছে, জমা করেছে।
مَالاً — ধন, সম্পদ।
عَدَّدَهٗ — তা গণনা করেছে।
يَحْسَبُ — সে ধারণা করে।
اَخْلَدَهٗ — তাকে চিরকাল রাখবে, অমর করবে।
كَلَّا — কখনও না।
لَيُنْبَذَنَّ — সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে।
اَلْحُطَمَةُ — চুর্ণ-বিচুর্ণকারী, একটি জাহান্নামের নাম হুতামা।
نَارٌ — আগুন।
اَلْمُوْقَدَةُ — প্রজ্বলিত।
تَطَّلِعُ — গ্রাস করবে।
اَفْئِدَةٌ — হৃদয়, অন্তঃকরণ।
مُؤْصَدَةٌ — পরিবেষ্টিত।
عَمَدٌ — স্তম্ভ।
مُمَدَّدَةٌ — দীর্ঘায়িত।